সুকান্ত-সমগ্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী :: কলিকাতা-৬

সুকান্ত-সমগ্র

সূচীপত্র

ঘুম নেই

পূর্বাভাস

গীতিগুচ্ছ

মিঠেকড়া

অভিযান

হরতাল

অপ্রচলিত রচনা

কবিতা :

সুকান্ত সমগ্র

জন্ম : ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৩

মৃত্যু : ২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪

বাংলা সাহিত্যের একটি প্রিয়তম নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাঙালীর ঘরে ঘরে নিঃসন্দেহে একটি প্রিয়তম গ্রন্থ হবে 'সুকান্ত-সমগ্র'। সুকান্তর সব লেখা একত্রে পাওয়ার বাসনা আমাদের বহু দিনের এবং বহু জনের। এতদিনে সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে সারস্বত লাইব্রেরী আমাদের ধন্যবাদার্হ হলেন।

আমি জানি, কাজটা সহজ ছিল না। লেখাগুলো ছিল নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ক্রমে ক্রমে সেসব প্রকাশকের হাতে আসতে সময় লেগেছে। সব যে নিঃশেষে পাওয়া গেছে, আমাদের নজর এড়িয়ে কোথাও যে প'ড়ে নেই—এখনও খুব জোর ক'রে সে কথা বলা যায় না। সুকান্তর লেখা উদ্ধারের কাজে কত জন যে কতভাবে সাহায্য করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। 'সুকান্ত-সমগ্র' আসলে নানা দিক থেকে নানা লোকের সাহায্যের যোগফল।

লেখা পাওয়ার পর দেখা দিয়েছে আরেক সমস্যা।

কোনো কোনো লেখা পাওয়া গেছে ছাপার হরফে, কোনোটা বা হাতের লেখায়। কখনও ছাপানো লেখাকে, কখনও বা পাণ্ডুলিপিকে চূড়ান্ত ব'লে মানতে হয়েছে। কিন্তু ছাপানো লেখা আর তার পাণ্ডুলিপিতে যদি অমিল থাকে? ঢালাওভাবে সেই অসামঞ্জস্যকে ছাপার ভুল ব'লে মানা হবে? বদলটা প্রেস-কপিতেও হয়ে থাকতে পারে। কাজেই ছাপার হরফে আর পাণ্ডুলিপিতে গরমিল হ'লে সেটা লেখকের ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত, অভিপ্রেত না অনভিপ্রেত, এ বিষয়ে দ্বিধায় পড়তে হয়। যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তাও যে লেখাটির প্রাথমিক খসড়া নয়—সেটা যে প্রেস-কপির হুবহু নকল—তাই বা জোর ক'রে কিভাবে বলা যাবে। তাছাড়া লেখার ভুলে পাণ্ডুলিপিতেও অনেক সময় গোলমাল থাকে; বানানের অনিয়ম ছাড়াও যতি চিহ্নের অসতর্কতায় পাঠকের ভুল বুঝবার আশঙ্কা থেকে যায়।

সুতরাং যদ্দৃষ্টং তম্মুদ্রিতং করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। বানানে সমতা আনবার চেষ্টা করতে হয়েছে, যতি চিহ্নের ব্যাপারে জায়গায় জায়গায় হস্তক্ষেপের দরকার হয়েছে এবং মুদ্রিত আর পাণ্ডুলিপিগত অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে দুটোর একটিকে বেছে নিতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, এর কোনোটাই অনড় অচল ব্যবস্থা নয়—পরে প্রয়োজনবোধে রদবদল হ'তে পারে।

এর চেয়েও জটিল আরেকটি সমস্যা আছে। সে সম্বন্ধে আজকের পাঠকদের অবহিত করতে চাই। সমস্যাটি সাধারণভাবে লেখার নির্বাচন সংক্রান্ত।

মাত্র একুশ বছর সুকান্ত পৃথিবীতে বেঁচে ছিল। আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য সুকান্তকে আশ্চর্য প্রতিভা ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক বিকশিত হওয়ার মুখেই সেই আশ্চর্য প্রতিভাকে আমরা হারিয়েছি।

বয়স বাড়লে নিজেদের কম বয়সের লেখা সম্বন্ধে লেখকেরা স্বভাবতই খুব খুঁতখুঁতে হন। অনেকের কাঁচা বয়সের লেখার কথা তো পরে আমরা জানতেও পারি না। অথবা জানলেও, তাঁদের পাকা হাতের লেখাগুলো সংখ্যায় আর পরিমাণে তাঁদের কাঁচা হাতের লেখাগুলোকে ঢেকে দিতে পারে।

সুকান্ত সেদিক থেকে সত্যিই মন্দভাগ্য। অকালমৃত্যু সুকান্তকে বাংলা সাহিত্যে শুধু বিপুলতর গৌরব লাভের সুযোগ থেকেই বঞ্চিত করে নি। সেই সঙ্গে লেখার সংখ্যায় আর পরিমাণে পরিণতির চেয়ে প্রতিশ্রুতির পাল্লাই ভারী করেছে।

বেঁচে থাকলে সুকান্তর কিছু লেখা যে 'সুকান্ত-সমগ্র'তে স্থান পেত না, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে আমি ছিলাম সুকান্তর অগ্রজ ; তার কবিমনের অনেক কথাই আমার জানা ছিল। তার কবিতা যখন নতুন মোড় নিচ্ছিল, তখনই দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তাকে হারিয়েছি। সুকান্তর যে সব কবিতা প'ড়ে আমরা চমকাই, সুকান্তর পক্ষে সে সবই আরম্ভ মাত্র।

সুকান্তর যখন বালক বয়স, তখন থেকেই তার কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-এ পড়ছি। 'পদাতিক' বেরিয়ে তখন পুরনো হয়ে গেছে। রাজনীতিতে আপাদমস্তক ডুবে আছি। ক্লাস পালিয়ে বিডন স্ট্রীটের চায়ের দোকানে আমাদের আড্ডা। কলেজের বন্ধু মনোজ একদিন জোর ক'রে আমার হাতে একটা কবিতার খাতা গছিয়ে দিল। প'ড়ে আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি কবিতাগুলো সত্যিই তার চৌদ্দ বছর বয়সের খুড়তুতো ভাইয়ের লেখা। শুধু আমি কেন, আমার অন্যান্য বন্ধুরা, এমন কি বুদ্ধদেব বসুও কবিতার সেই খাতা প'ড়ে অবাক না হয়ে পারেন নি।

আমার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যেই বোধহয় মনোজ একদিন কিশোর সুকান্তকে সেই চায়ের দোকানে এনে হাজির করেছিল। সুকান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে সেদিন কেন আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম, সে বিষয়ে কেউ যদি আমাকে জেরা করে আমি সদুত্তর দিতে পারব না।

সে সব কবিতা পরে 'পূর্বাভাস'-এ ছাপা হয়েছে। তাতে কী এমন ছিল যে, প'ড়ে সেদিন আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ? আজকের পাঠকেরা আমাদের সেদিনকার বিস্ময়ের কারণটা ধরতে পারবেন না। কারণ, বাংলা কবিতার ধারা তারপর অনেকখানি ব'য়ে এসেছে। কোনো কিশোরের পক্ষে ঐ বয়সে ছন্দে অমন আশ্চর্য দখল, শব্দের অমন লাগসই ব্যবহার সেদিন ছিল অভাবিত। হালে সে জিনিস প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানায় খেতে খামারে ঘরে ঘরে সবে পৌঁছে দিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আরম্ভেই সমাপ্তির এই শোকে বাংলা সাহিত্য চিরদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

সুকান্ত বেঁচে থাকতে তার অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে আমার চেয়ে কড়া সমালোচক আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। এখন ভেবে খারাপ লাগে। সামনাসামনি তাকে কখনো আমি বাহবা দিই নি। তার লেখায় সামান্য ত্রুটিও আমি কখনও ক্ষমা করি নি।

এ প্রসঙ্গ তুলছি স্মৃতিচারণার জন্যে নয়। পাঠকেরা পাছে বিচারে ভুল করেন, তার যুগ আর তার বয়স থেকে পাছে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন—সেইজন্যে গোড়াতেই আজকের পাঠকদের খানিকটা হুঁশিয়ার ক'রে দিতে চাই।

খুঁত ধরব জেনেও, নতুন কিছু লিখলেই সুকান্ত আমাকে একবার না শুনিয়ে ছাড়ত না। আমি তখন কবিতা ছেড়ে 'জনযুদ্ধ' নিয়ে ডুবে আছি। অফিসে ব'সে কথা বলবারও বেশি সময় পেতাম না। আমাদের অধিকাংশ কথাবার্তা হত সভায় কিংবা মিছিলে যাতায়াতের রাস্তায়। 'কী নিয়ে লিখব' —এটা কখনই আমাদের আলোচনার বিষয় হত না। 'কেমন ক'রে লিখব' —এই নিয়েই ছিল আমাদের যত মাথাব্যথা।

কিশোর বাহিনীর আন্দোলনে সুকান্তকে টেনে এনেছিল তখনকার ছাত্রনেতা এবং আমাদের বন্ধু অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। রাজনীতিতে শুক্‌নো ভাব তখন অনেকখানি কেটে গিয়ে নাচ গান নাটক আবৃত্তির ভেতর দিয়ে বেশ একটা রসকষ এসেছে। কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের যেমন রাজনীতির আসরে ঢুকতে হয়েছিল, সুকান্তর বেলায় তা হয় নি। সুকান্তর সাহিত্যিক গুণগুলোকে আন্দোলনের কাজে লাগানোর ব্যাপারে অন্নদারও যথেষ্ট হাতযশ ছিল। সুকান্তর আগের যুগের লোক ব'লে আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে; আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোনো দ্বিধা ছিল না।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সে সুকান্ত যেভাবে লিখেছিল—বেঁচে থাকলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও সেই একই ভাবে লিখে যেত। সুকান্তকে আমি ছোট থেকে বড় হতে দেখেছি ব'লেই জানি, এক জায়গায় থেকে যাওয়া সুকান্তর পক্ষে অসম্ভব ছিল। 'পূর্বাভাসে' আর 'ঘুম নেই'তে অনেক তফাত। তেমনি সুস্পষ্ট তফাত 'ছাড়পত্রে'র প্রথম দিকের আর শেষ দিকের লেখায়।

তাছাড়া কবিতা ছেড়ে সুকান্ত পরের জীবনে উপন্যাসে চলে যেত কিনা তাই বা কে বলতে পারে? বেঁচে থাকলে কী হত তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার আজ হয়ত কোনো মানে নেই, কিন্তু কাজে হাত দিয়েই সুকান্তকে চলে যেতে হয়েছে—এ কথা ভুলে গেলে সুকান্তর প্রতি অবিচার করা হবে।

আমি আবার বলছি, 'সুকান্ত-সমগ্র'তে এমন অনেক লেখা আছে, যে লেখা হয়ত সুকান্তের সাজে না। সুকান্ত দীর্ঘজীবী হলে ছেলে বয়সের সে সব লেখা হয়ত তার বইতে স্থানও পেত না—আমার মতামত চাইলে আমিও ছাপাবার বিরুদ্ধে রায় দিতাম।

কিন্তু সুকান্তর অকালমৃত্যু আমাদেরও হাত বেঁধে দিয়েছে। সুকান্ত বেঁচে থাকলে যে জোর খাটানো যেত, এখন আর সে জোর খাটানো চলে না। ওর ছেলেবেলার লেখায় খোদকারি করেছি, বড় হওয়ার পরেও ওর লেখা নিয়ে খুঁত খুঁত করেছি—এই বিশ্বাসে যে, আমরা যাই বলি না কেন মানা না মানার শেষ বিচার ওর হাতে।

এখন সুকান্তর লেখা আর সুকান্তর নয়—দেশের এবং দশের। আমার কিংবা আর কারো একার বিচার সেখানে খাটবে না। কাজেই যে লেখা যেমন তাকে ঠিক সেইভাবেই কালের দরবারে হাজির করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। 'সুকান্ত-সমগ্র'র সার্থকতা সেইখানেই।

ভাবতে অবাক লাগে, সুকান্ত বেঁচে থাকলে আজ তার একচল্লিশ বছর বয়স হত। কেমন দেখতে হত সুকান্তকে? জীবনে কোন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সে যেত? তার লেখার ধারা কোন পথে বাঁক নিত?

অসুখে পড়বার অল্প কিছুদিন আগে একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক মিটিঙে যাবার পথে আমার এক সংশয়ের জবাবে সুকান্ত বলেছিল: আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি—কেননা এই দলবলই তো বাড়তে বাড়তে একদিন এ দেশের অধিকাংশ হবে।

সেদিন তর্কে আমি ওকে হারাতে চেষ্টা করেছিলাম। আজ আমাকে মানতেই হবে, একদিক থেকে তার কথাটা মিথ্যে নয়। গত কুড়ি বছর ধরে সুকান্তর বই বাংলা দেশের প্রায় ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে তার একটা ছাপা বই থেকে শ'য়ে শ'য়ে হাতে লিখে নকল করে লোকে সযত্নে ঘরে রেখেছে। আর পাঠককুল ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সুকান্ত মুখে যাই বলুক, আসলে সে শুধু পার্টির কর্মীদের জন্যেই লেখে নি। যে নতুন শক্তি সমাজে সেদিন মাথা তুলেছিল, সুকান্ত তার বুকে সাহস, চোখে অন্তর্দৃষ্টি আর কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছিল। এ কথাও ঠিক নয়, কাউকে খুশি করার জন্যে সুকান্ত লিখেছিল। তাগিদটা বাইরে থেকে আসে নি, এসেছিল তার নিজের ভেতর থেকে। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আসলে নিজেকেই সে কবিতায় ঢেলে দিয়েছিল।

কী ভাবে বলেছিল সেটাও দেখতে হবে। সুকান্তর আগে আর কেউ ওকথা ওভাবে বলে নি ব'লেই পাঠকেরা কান খাড়া ক'রে তার কথা শুনেছেন। বলবার উদ্দেশ্যটা যাঁদের মনের মত ছিল না, বলবার গুণে তাঁরাও না শুনে পারেন নি।

সুকান্তর মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন: '...যে কবির বাণী শোনবার জন্যে কবিগুরু কান পেতেছিলেন সুকান্ত সেই কবি। শৌখিন মজদুরি নয়, কৃষাণের জীবনের সে ছিল সত্যকার শরিক, কর্মে ও কথায়

তাঁদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তার, মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তার দেহমন। মাটির বুক থেকে সে উঠে এসেছিল।

'...ব্যক্তিজীবনে সুকান্ত একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু এই শেষ চার পংক্তিতে ('আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,/নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ, / অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা, আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন' : 'ঐতিহাসিক', ছাড়পত্র) কবি সুকান্ত যে আদর্শের কথা বলে গেছে তা পৃথিবীর সমস্ত মতবাদের চেয়েও প্রাচীন, সমস্ত আদর্শের চেয়েও বড়।...

'...তার প্রথম দিকের অনেক রচনাতেই দলীয় শ্লোগান অতি স্পষ্ট ছিল; কিন্তু মনের বালকত্ব উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রকাশকে অনন্যপরতন্ত্র করে তুলেছিল।...'

('কবিকিশোর' : পরিচয় শারদীয়, ১৯৫৪)

এ কিন্তু ভঙ্গি দিয়ে ভোলানো নয়, কবিতার গুণে দূরের মানুষকে কাছে টানা।

সমসাময়িকদের মধ্যে যে কাজ আর কেউ পারে নি, সুকান্ত একা তা করেছে—আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বার বহুজনের জন্যে সে খুলে দিয়ে গেছে। কবিতাবিমুখ পাঠকদের কবিতার রাজ্যে জয় ক'রে আনার কৃতিত্ব সুকান্তর। তারই সুফল আজ আমরা ভোগ করছি।

সুকান্তর মৃত্যুর পর সুকান্তকে অনুকরণের একটা যুগ গেছে। কারো কারো এ ধারণাও হয়েছিল যে, রাজনৈতিক আন্দোলনই বুঝি সুকান্তকে তুলে ধরেছিল। সুকান্তর অক্ষম অনুকারকেরা কবিতার ভুষ্টিনাশ ক'রে বক্তব্যকে বুলিসর্বস্ব ক'রে তুললেন। হিতে বিপরীত হল। একটা সময় এল, পাঠকেরা বেঁকে বসল—সেই পাঠকেরাই, যারা এর আগে এবং পরেও সুকান্ত প'ড়ে তৃপ্তি পেয়েছে।

সুকান্তর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের তোলাতুলি বা কোলাকুলির সম্পর্ক ছিল না—এটা না বোঝার জন্যেই একদল কবির মধ্যে এক সময় রাজনীতি থেকে আশাভঙ্গজনিত পালাও-পালাও রব উঠেছিল। যে যার নিজের মধ্যে তাঁরা পালিয়ে গেলেন। তাতেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের মুশকিলের আশান হয় নি।

ভুল হয়েছিল বুঝতে। সুকান্ত রাজনীতির কাঁধে চড়ে নি। রাজনীতিকে নিজের ক'রে নিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও সুকান্তকে দিয়েছে তাই সানন্দ স্বীকৃতি। নিজেকে নিঃশর্তে জীবনের হাতে সঁপে দেওয়াতেই স্বতোৎসারিত হতে পেরেছিল সুকান্তর কবিতা।

আজ যাঁরা সুকান্তর কবি প্রতিভাকে এই ব'লে উড়িয়ে দিতে চান যে, সুকান্তর কবিতায় শ্লোগান ছিল—তাঁদের বলতে চাই, সুকান্তর কবিতায় শ্লোগান নিশ্চয়ই ছিল। কবিতার জাত যাবার ভয়ে শ্লোগানগুলোকে রেখে ঢেকেও সে ব্যবহার করে নি। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত যে ভাষা হাজার হাজার মানুষের নানা আবেগের তরঙ্গ তুলেছে, তাকে কবিতায় সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছিল বলেই সুকান্ত সার্থক কবি। কবিতায় রাজনীতি থাকলেই যাঁদের কাছে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়, তাঁরা ভুলে যান—অরাজনৈতিক কবিতায়ও জিগির কিছু কম নেই। আসলে আপত্তিটা বোধহয় শ্লোগান নয়, শ্লোগান বিশেষে—রাজনীতিতে নয়, রাজনীতি বিশেষে। তাঁদের কাছে অনুরোধ, কবিতার দোহাই না তুলে মনের কথাটা খুলে বলুন।

কবিতায় সুকান্তই যে শেষ কথা, তার পথই যে একমাত্র পথ—মতিভ্রম না হলে কেউ সে কথা বলবে না। সাহিত্যে অনুকারকের স্থান নেই, এ তো সবাই জানে। সুকান্তর কবিতা সুকান্তকে ছাড়া আর কাউকেই মানাবে না। সুকান্তর পরবর্তী যে-কবি সুকান্ত থেকে তফাত করবে, নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে—সে আমাদের প্রশংসা পাবে। কেননা আত্মমর্যাদা না থাকলে অন্যকে মর্যাদা দেওয়া যায় না। সুকান্তকে ছাড়িয়ে যাওয়াই হবে সুকান্তকে সম্মান জানানো।

আমার এ ভূমিকা, বিশেষ ক'রে, সুকান্তর আজকের পাঠকদের জন্যে। আমি সমালোচক নই। বাংলা সাহিত্যে সুকান্তর কী দান, কোথায় তার স্থান—সে সব স্থির করবার জন্যে যোগ্য ব্যক্তিরা আছেন। 'সুকান্ত-সমগ্র' পাঠকদের হাতে ধরিয়ে দিয়েই আমি খালাস।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, শেষ করবার আগে সেই কথাতেই আবার ফিরে আসতে চাই। মনে রাখবেন, সুকান্তর বয়স আজ একচল্লিশ নয়। আজও একুশ।

সুকান্তর জন্ম বাংলা ১৩৩৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ। সুকান্তর বাবা স্বর্গত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। কলকাতায় কালীঘাটে মাতামহের ৪২, মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ীতে সুকান্তর জন্ম। সুকান্তর জীবনের অনেক কথাই সুকান্তর ছোট ভাই অশোক ভট্টাচার্যের লেখা 'কবি সুকান্ত' প'ড়ে জেনে নিতে পারবেন। আমি শুধু তার একুশ বছরের জীবনের কয়েকটা দিক মোটা দাগে তুলে ধরতে চাই।

সুকান্তদের পৈতৃক ভিটে ছিল ফরিদপুর জেলায়। সুকান্তর জ্যাঠামশাই ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত। বাড়িতে ছিল সংস্কৃত পঠনপাঠনের আবহাওয়া। পরে এই প্রাচীন পন্থার পাশাপাশি উঠতি বয়সীদের আধুনিক চিন্তা-ভাবনার একটা পরিমণ্ডলও গ'ড়ে ওঠে। সুকান্ত ছেলেবেলায় মা-র মুখে শুনেছে কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সুকান্তর বাবা আর জ্যাঠামশাই অসহায় অবস্থা থেকে নিজেদের পুরুষকারের জোরে বিদেশ বিভুঁইতে এসে বড় হয়েছিলেন। বইয়ের প্রকাশ ব্যবসা ছাড়াও সুকান্তর বাবা আর জ্যাঠামশাইয়ের ছিল যজমানি আর পণ্ডিত বিদায়ের আয়। বেলেঘাটায় নিজেদের বাড়ি ছেড়ে পৃথক হওয়ার আগে পর্যন্ত যৌথ পরিবার স্বচ্ছলভাবেই চলত। সুকান্তর মাতামহ পণ্ডিত বংশের মানুষ হয়েও প্রাচীন সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। এরই ভেতর দিয়ে বহু আত্মীয়স্বজনের ভিড়ে হেসে খেলে কেটেছিল সুকান্তর শৈশব। ন-দশ বছর বয়স থেকেই সে ছড়া লিখে বাড়িতে কবি হিসেবে নাম কিনেছিল। লেখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলত নানারকমের বই পড়া। সুকান্ত ছোট থাকতেই ক্যান্সার রোগে সুকান্তর মা মারা গেলেন। ছেলেবেলা থেকেই সুকান্তর ছিল অন্তর্মুখী মন। ইস্কুলে সুকান্ত বন্ধু হিসেবে পেয়েছিল পরবর্তীকালের যশস্বী কবি অরুণাচল বসুকে। অরুণাচলের মা সরলা বসুর ('জলবনের কাব্য'র লেখিকা) প্রভাব সুকান্তর জীবনে কম নয়। খেলার মধ্যে তার প্রিয় ছিল ব্যাডমিণ্টন আর দাবা। পরোপকারে ছেলেবেলা থেকেই দল বাঁধায় তার ছিল প্রবল উৎসাহ। শহরে মানুষ হ'লেও সুকান্ত ছিল গাছপালা মাঠ আকাশের ভক্ত।

পরের জীবন মোটামুটি তার কবিতায়ই পাওয়া যাবে। সুকান্তর কবিতা কখনই তার জীবন থেকে আলাদা নয়।

তবু সুকান্তর একটা নতুন দিক 'সুকান্ত-সমগ্র'তে তার চিঠিপত্রে পাঠকদের কাছে এই প্রথম ধরা পড়বে। যখন তাঁরা পড়বেন :

'বাস্তবিক, আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই···কোনো গহন অরণ্যে কিংবা অন্য যে কোন নিভৃততম প্রদেশে, যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মতো স্পষ্টমনা হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ।···

কিংবা

'সেখানে আমি ঘন ঘন যেতে লাগলুম।···ওর আকর্ষণে অবিশ্যি নয়। বাস্তবিক আমাদের সম্পর্ক তখনও অন্য ধরনের ছিল, সম্পূর্ণ অকলঙ্ক, ভাইবোনের মতোই।' (পত্রগুচ্ছ)

কিংবা যে চিঠিতে পার্টি সম্পর্কেও সুকান্ত অভিমান প্রকাশ করেছে।

এ কি আমাদের সেই একই সুকান্ত? 'ছাড়পত্র' আর 'ঘুম নেই'-এর?

হ্যাঁ, একই সুকান্ত। কখনও বিষণ্ণ, কখনও আশায় উন্মুখ। কখনও আঘাতে কাতর, কখনও সাহসে দুর্জয়। কখনও চায় জনতা, কখনও নির্জনতা। কোথাও ভালবাসার কথা মুখ ফুটে বলতেই পারে না, কোথাও ঘৃণায় হুংকার দিয়ে ওঠে।

সুকান্ত কাগজের মানুষ নয়, রক্তমাংসের মানুষ। তার আত্মবিশ্বাস কখনও কখনও অহমিকাকে স্পর্শ করে, তার যুক্তি কখনও কখনও আবেগে ভেঙে পড়ে।

সুকান্ত বড় কবি হলেও বয়স তার একুশ পেরোয় নি। তার বেশীর ভাগ লেখাই আরও কম বয়সের।

'সুকান্ত-সমগ্র' সুকান্তর মহৎ সম্ভাবনাকে মনে করিয়ে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তার অভাববোধকে নিরন্তর জাগিয়ে রাখবে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, বেঁচে থাকলে এতদিনে সুকান্তর এত বছর বয়স হত। কা লিখত সে? কেমন দেখতে হত?

তখন আমার চোখে তার ছবিটাই বদলে যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

'সুকান্ত-সমগ্র'র ষষ্ঠ সংস্করণে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ও পরিবর্তন করা হল। 'ক্ষুধা', 'দুর্বোধ্য', 'ভদ্রলোক', 'দরদী কিশোর' ও 'কিশোরের স্বপ্ন'—এই পাঁচটি গল্প এবং 'ছন্দ ও আবৃত্তি' প্রবন্ধটি এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত হয়েছে 'ব্যর্থতা' ও 'দেবদারু গাছে রোদের ঝলক' কবিতা দুটি এবং একাধিক চিঠি। পত্রগুচ্ছ ও অপ্রচলিত রচনা-সমূহ রচনার কালক্রম অনুসারে সাজানো হল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে ও পাওয়া গেছে, সে সবই সুকান্ত-সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আয়তন বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই সংস্করণের দাম বাড়ানো হল না।

প্রকাশক

ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান :
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,

আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস ॥

আগামী

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা ;
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় :
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড় :
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।

আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে .
জয়ধ্বনি কিশলয়ে : সম্বর্ধনা জানাবে সকলে ।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি ।
সেদিন ছায়ায় এসো : হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে ;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি ।
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে ।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে,
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে ।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে ;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে ।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

চারাগাছ

ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি :
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে :
সে প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায় ;
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি—

এ অট্টালিকার প্রতি ইঁটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের, রক্তের আর চোখের জলের।
তবু এই প্রাসাদকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে
সেলাম জানায় লোকে, চেয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়ে।
আমি তাই এ প্রাসাদে এতকাল ঐশ্বর্য দেখেছি,
দেখেছি উদ্ধত এক বনিয়াদী কীর্তির মহিমা।

হঠাৎ সেদিন
চকিত বিস্ময়ে দেখি
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা।

অমনি পৃথিবী
আমার চোখের আর মনের পর্দায়
আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিল একটি পলকে।

ছোট ছোট চারাগাছ--
রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে।

হঠাৎ চকিতে,
এ শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরুহ
শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল
উদ্ধত প্রাচীন সেই বনিয়াদী প্রাসাদের দেহে।

ছোট ছোট চারাগাছ—
নিঃশব্দে হাওয়ায় দোলে, কান পেতে শোনে :
প্রত্যেক ইঁটের নীচে ঢাকা বহু গোপন কাহিনী
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের।

তাইতো অবাক আমি, দেখি যত অশ্বত্থচারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে !

মনে হয়, এইসব অশ্বত্থ-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত ॥

খবর

খবর আসে !
দিগ্ দিগন্ত থেকে বিদ্যুদ্বাহিনী খবর ;
যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়—
—এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।
রাত গভীর হয় যন্ত্রের ঝঙ্কৃত ছন্দে—প্রকাশের ব্যগ্রতায় ;
তোমাদের জীবনে যখন নিদ্রাভিভূত মধ্যরাত্রি
চোখে স্বপ্ন আর ঘরে অন্ধকার।

অতল অদৃশ্য কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দ শব্দেরা উঠে আসে ;
অভ্যস্ত হাতে খবর সাজাই—
ভাষা থেকে ভাষান্তর করতে কখনো চমকে উঠি,
দেখি যুগ থেকে যুগান্তর।
কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে ;
বাইশে শ্রাবণ, বাইশে জুনে।

তোমাদের ঘুমের অন্ধকার পথ বেয়ে
খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে,
তাদের পেয়ে কখনো কণ্ঠে নামে ব্যথা, কখনো বা আসে গান ;
সকালে দিনের আলোয় যখন তোমাদের কাছে তারা পৌঁছোয়
তখন আমাদের চোখে তাদের ডানা ঝরে গেছে।
তোমরা খবর পাও,
শুধু খবর রাখো না কারো বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের।
ঐ কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতায়
কোনো ফাঁকে ?
পুরনো ভাঙা চশমায় ঝাপসা মনে হয় পৃথিবী—
৯ই আগস্টে কি আসাম সীমান্ত আক্রমণে ?
জ্বলে ওঠে কি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধে, মহাত্মাজীর মুক্তিতে,
প্যারিসের অভ্যুত্থানে ?
দুঃসংবাদকে মনে হয় না কি
কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা ?
যে খবর প্রাণের পক্ষপাতিত্বে অভিষিক্ত
আত্মপ্রকাশ করে না কি বড় হরফের সম্মানে ?
এ প্রশ্ন অব্যক্ত অনুচ্চারিত থাকে
ভোরবেলাকার কাগজের পরিচ্ছন্ন ভাঁজে ভাঁজে।

শুধু আমরা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি!
তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের—
কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে?
কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই আমরা খবর পাই
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।
তাই তোমাদের আগেই খবর-পরীরা এসেছে আমাদের
চেতনার পথ বেয়ে
আমার হৃদ্‌যন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা—
পৃথিবী মুক্ত —জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।
তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে আজো স্বপ্ন।
কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখেমুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়।

আজ তোমরা এখনো ঘুমে॥

ইউরোপের উদ্দেশে

ওখানে এখন মে-মাস তুষার-গলানো দিন,
এখানে অগ্নি-ঝরা বৈশাখ নিদ্রাহীন;
হয়তো ওখানে শুরু মন্থর দক্ষিণ হাওয়া,
এখানে বোশেখী ঝড়ের ঝাপ্টা পশ্চাৎ ধাওয়া;
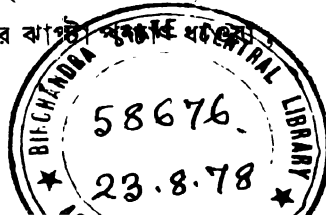
এখানে সেখানে ফুল ফোটে আজ তোমাদের দেশে
কত রঙ, কত বিচিত্র নিশি দেখা দেয় এসে।
ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে কত ছেলেমেয়ে
এই বসন্তে কত উৎসব কত গান গেয়ে।
এখানে তো ফুল শুকানো, ধূসর রঙের ধুলোয়
খাঁ-খাঁ করে সারা দেশটা, শান্তি গিয়েছে চুলোয়
কঠিন রোদের ভয়ে ছেলেমেয়ে বন্ধ ঘরে,
সব চুপচাপ : জাগবে হয়তো বোশেখী ঝড়ে।
অনেক খাটুনি, অনেক লড়াই করার শেষে
চারিদিকে ক্রমে ফুলের বাগান তোমাদের দেশে ;
এদেশে যুদ্ধ, মহামারী, ভুখা জ্বলে হাড়ে হাড়ে—
অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মের মাঠে তাই ঘুম কাড়ে
বেপরোয়া প্রাণ ; জমে দিকে দিকে আজ লাখে লাখ—
তোমাদের দেশে মে-মাস ; এখানে ঝোড়ো বৈশাখ ॥

প্রস্তুত

কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়,
নানাদিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়।
ভীত মন খোঁজে সহজ পন্থা, নিষ্ঠুর চোখ :
তাই বিষাক্ত আস্বাদময় এ মর্তলোক,
কেবলি এখানে মনের দ্বন্দ্ব আগুন ছড়ায়।

অবশেষে ভুল ভেঙেছে, জোয়ার মনের কোণে,
তীব্র ভ্রূকুটি হেনেছি কুটিল ফুলের বনে ;
অভিশাপময় যে সব আত্মা আজো অধীর,
তাদের সকাশে রেখেছি প্রাণের দৃঢ় শিবির ;
নিজেকে মুক্ত করেছি আত্মসমর্পণে।

চাঁদের স্বপ্নে ধুয়ে গেছে মন যে-সব দিনে,
তাদের আজকে শত্রু বলেই নিয়েছি চিনে,
হীন স্পর্ধারা ধূর্তের মতো শক্তিশেলে --
ছিনিয়ে আমায় নিতে পারে আজো সুযোগ পেলে
তাই সতর্ক হয়েছি মনকে রাখি নি ঋণে।

অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে
নরম সোফায় বিপ্লবী মন উদ্বোধনে ;
আজকে কিন্তু জনতা-জোয়ারে দোলে প্লাবন,
নিরন্ন মনে রক্তিম পথ অনুধাবন,
করছে পৃথিবী পূর্ব-পন্থা সংশোধনে।

অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই ;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখি নি মনেতে কোনো আসন,
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই ॥

প্রার্থী

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা ক'রে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক-টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক-টুকরো রোদ্দুর—
এক-টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিকে-ওদিকে যাই—
এক-টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—

শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব !
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবু সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায় —
আরো দু'তিনটি মুরগীর সাথে।

আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত —
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।

তারপর শুরু হ'লো তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা:
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার!

তারপর একদিন আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার —
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেলো বন্ধ হয়ে।
— খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বার বার চেষ্টা ক'রলে প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেলো প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে —
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার!'

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চ'লে এলো
ধবধবে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয় —
খাবার হিসেবে॥

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

তারপর শুরু হল তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা :
আশ্চর্য ! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার !

তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এল অংশীদার—
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে ।

খাবার ! খাবার ! খানিকটা খাবার !
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড ।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন দেখে -
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার' !

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপ্‌ধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে ;
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে ॥

সিঁড়ি

আমরা সিঁড়ি,
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে ;
তোমাদের পদধূলিধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।

তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত,
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি।

তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন ॥

কলম

কলম, তুমি কত না যুগ কত না কাল ধ'রে
অক্ষরে অক্ষরে
গিয়েছ শুধু ক্লান্তিহীন কাহিনী শুরু ক'রে।
কলম, তুমি কাহিনী লেখ, তোমার কাহিনী কি
দুঃখে জ্বলে তলোয়ারের মতন ঝিকিমিকি ?

কলম, তুমি শুধু বারংবার,
আনত ক'রে ক্লান্ত ঘাড়
গিয়েছ লিখে স্বপ্ন আর পুরনো কত কথা,
সাহিত্যের দাসত্বের ক্ষুধিত বশ্যতা।
ভগ্ন নিব, রুগ্ন দেহ, জলের মতো কালি,
কলম, তুমি নিরপরাধ তবুও গালাগালি
খেয়েছ আর সয়েছ কত লেখকদের ঘৃণা,
কলম, তুমি চেষ্টা কর, দাঁড়াতে পার কি না।

হে কলম ! তুমি কত ইতিহাস গিয়েছ লিখে
লিখে লিখে শুধু ছড়িয়ে দিয়েছ চতুর্দিকে।
তবু ইতিহাস মূল্য দেবে না, এতটুকু কোণ
দেবে না তোমায়, জেনো ইতিহাস বড়ই কৃপণ
কত লাঞ্ছনা, খাটুনি গিয়েছে লেখকের হাতে
ঘুমহীন চোখে অবিশ্রান্ত অজস্র রাতে।
তোমার গোপন অশ্রু তাইতো ফসল ফলায়
বহু সাহিত্য বহু কাব্যের বুকের তলায়।
তবু দেখ বোধ নেই লেখকের কৃতজ্ঞতা,
কেন চলবে এ প্রভুর খেয়ালে, লিখবে কথা ?

হে কলম! হে লেখনী! আর কত দিন
ঘর্ষণে ঘর্ষণে হবে ক্ষীণ?
আর কত মৌন-মূক, শব্দহীন দ্বিধান্বিত বুকে
কালির কলঙ্ক চিহ্ন রেখে দেবে মুখে?
আর, কত আর
কাটবে দুঃসহ দিন দুর্বার লজ্জার?
এ দাসত্ব ঘুচে যাক, এ কলঙ্ক মুছে যাক আজ,
কাজ কর—কাজ।

মজুর দেখ নি তুমি? হে কলম, দেখ নি বেকার?
বিদ্রোহ দেখ নি তুমি? রক্তে কিছু পাও নি শেখার?
কত না শতাব্দী, যুগ থেকে তুমি আজো আছ দাস,
প্রত্যেক লেখায় শুনি কেবল তোমার দীর্ঘশ্বাস!
দিন নেই, রাত্রি নেই, শ্রান্তিহীন, নেই কোনো ছুটি,
একটু অবাধ্য হলে তখুনি ভ্রূকুটি;
এমনি করেই কাটে দুর্ভাগা তোমার বারো মাস,
কয়েকটি পয়সায় কেনা, হে কলম, তুমি ক্রীতদাস।
তাই যত লেখ, তত পরিশ্রম এসে হয় জড়ো:
—কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ;
উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে,
কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে॥

আগ্নেয়গিরি

কখনো হঠাৎ মনে হয় :
আমি এক আগ্নেয় পাহাড়।
শান্তির ছায়া-নিবিড় গুহায় নিদ্রিত সিংহের মতো
চোখে আমার বহু দিনের তন্দ্রা।
এক বিস্ফোরণ থেকে আর এক বিস্ফোরণের মাঝখানে
আমাকে তোমরা বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছ বারংবার
আমি পাথর : আমি তা সহ্য করেছি।

মুখে আমার মৃদু হাসি,
বুকে আমার পুঞ্জীভূত ফুটন্ত লাভা।
সিংহের মতো আধ-বোজা চোখে আমি কেবলই দেখছি :
মিথ্যার ভিতে কল্পনার মশলায় গড়া তোমাদের শহর,
আমাকে ঘিরে রচিত উৎসবের নির্বোধ অমরাবতী,
বিদ্রূপের হাসি আর বিদ্বেষের আতস-বাজি—
তোমাদের নগরে মদমত্ত পূর্ণিমা।

দেখ, দেখ :
ছায়াঘন, অরণ্য-নিবিড় আমাকে দেখ ;
দেখ আমার নিরুদ্বিগ্ন বন্যতা।
তোমাদের শহর আমাকে বিদ্রূপ করুক,
কুঠারে কুঠারে আমার ধৈর্যকে করুক আহত,
কিছুতেই বিশ্বাস ক'রো না—
আমি ভিসুভিয়স-ফুজিয়ামার সহোদর।

তোমাদের কাছে অজ্ঞাত থাক
ভেতরে ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠা আমার অগ্ন্যুদ্‌গার,
অরণ্য ঢাকা অন্তর্নিহিত উত্তাপের জ্বালা।

তোমার আকাশে ফ্যাকাশে প্রেত আলো,
বুনো পাহাড়ে মৃদু-ধোঁয়ার অবগুণ্ঠন :
ও কিছু নয়, হয়তো নতুন এক মেঘদূত।
উৎসব কর, উৎসব কর—
ভুলে যাও পেছনে আছে এক আগ্নেয় পাহাড়,
ভিসুভিয়স-ফুজিয়ামার জাগ্রত বংশধর।

আর,
আমাব দিন-পঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি॥

দুরাশার মৃত্যু

দ্বারে মৃত্যু,
বানে বানে লেগেছে জোয়ার,
পিছনে কি পথ নেই আর ?
আমাদের এই পলায়ন
জেনেছে মরণ,

অনুগামী ধূর্ত পিছে পিছে,
প্রস্থানের চেষ্টা হল মিছে।

দাবানল!
ব্যর্থ হল শুষ্ক অশ্রুজল,
বেনামী কৌশল
জেনেছে যে আরণ্যক প্রাণী
তাই শেষে নির্মূল বনানী॥

ঠিকানা

ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু -
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাও নি? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণকুটির গড়ি।
আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি,
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাই নাকো পথ,
তাইতো পথের নুড়িতে গড়ব
মজবুত ইমারত।

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে,
আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে।
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধ'রে
জেনো গচ্ছিত আছে।
আমাকে কি তুমি খুঁজেছ কখনো
সমস্ত দেশ জুড়ে?
তবুও পাও নি? তাহলে ফিরেছ
ভুল পথে ঘুরে ঘুরে।
আমার হদিশ জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছু দূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।
বন্ধু, কুয়াশা, সাবধান এই
সূর্যোদয়ের ভোরে;
পথ হারিও না আলোর আশায়
তুমি একা ভুল ক'রে।

বন্ধু, আজকে জানি অস্থির
রক্ত, নদীর জল,
নীড়ে পাখি আর সমুদ্র চঞ্চল।
বন্ধু, সময় হয়েছে এখনো
ঠিকানা অবজ্ঞাত

বন্ধু, তোমার ভুল হয় কেন এত ?
আর কতদিন দুচক্ষু কচ্‌লাবে,
জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধ'রে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

বন্ধু, আজকে বিদায় !
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,

লেনিন

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন—
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।

সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বন্ধ আস্ফালন,
কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার, চোখে মুখে চিহ্নিত মরণ।
বিপ্লব হয়েছে শুরু, পদানত জনতার ব্যগ্র গাত্রোত্থানে,
দেশে দেশে বিস্ফোরণ অতর্কিতে অগ্ন্যুৎপাত হানে।
দিকে দিকে কোণে কোণে লেনিনের পদধ্বনি
আজো যায় শোনা,
দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।
পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে,
লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর জঠরে।
আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের প্রত্যেক আকাশে
লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে ;
ইতালী, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন,
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।
অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ;
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভর্ৎসনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন !

লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।

মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন॥

অনুভব

॥ ১৯৪০ ॥

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি।
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন ;
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো -
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।
অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।
হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত—'রক্ত খরচ' তাতে ;
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম।

॥ ১৯৪৬ ॥

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখে নি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব
শুনেছ ? শুনছ উদ্দাম কলরব ?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাইতো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ ! বিপ্লব চারিদিকে ॥

কাশ্মীর

সেই বিশ্রী দম-আটকানো কুয়াশা আর নেই
নেই সেই একটানা তুষার-বৃষ্টি,
হঠাৎ জেগে উঠেছে—
সূর্যের ছোঁয়ায় চমকে উঠেছে ভূস্বর্গ।

দুহাতে তুষারের পর্দা সরিয়ে ফেলে
মুঠো মুঠো হলদে পাতাকে দিয়েছে উড়িয়ে,
ডেকেছে রৌদ্রকে,
ডেকেছে তুষার-উড়িয়ে-নেওয়া বৈশাখী ঝড়কে,
পৃথিবীর নন্দন-কানন কাশ্মীর।

কাশ্মীরের সুন্দর মুখ কঠোর হল
প্রচণ্ড সূর্যের উত্তাপে।
গলে গলে পড়ছে বরফ—
ঝরে ঝরে পড়ছে জীবনের স্পন্দন :
শ্যামল আর সমতল মাটির
স্পর্শ লেগেছে ওর মুখে,
দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ছে ওর চুল :
আন্দোলিত শাল, পাইন আর দেবদারুর বনে
ঝড়ের পক্ষে আজ সুস্পষ্ট সম্মতি।
কাশ্মীর আজ আর জমাট-বাঁধা বরফ নয় :
সূর্য-করোত্তাপে জাগা কঠোর গ্রীষ্মে
হাজার হাজার চঞ্চল স্রোত।

তাই আজ কাল-বৈশাখীর পতাকা উড়ছে
ক্ষুব্ধ কাশ্মীরের উদ্দাম হাওয়ায় হাওয়ায় ;
দুলে দুলে উঠছে
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঘুমন্ত, নিস্তব্ধ
বিরাট ব্যাপ্ত হিমালয়ের অসহিষ্ণু বুক॥

॥ ২ ॥

দম-আটকানো কুয়াশা তো আর নেই
নেই আর সেই বিশ্রী তুষার-বৃষ্টি,
সূর্য ছুঁয়েছে 'ভূস্বর্গ চঞ্চল'
সহসা জেগেই চমকে উঠেছে দৃষ্টি।

দুহাতে তুষার-পর্দা সরিয়ে ফেলে
হঠাৎ হলদে পাতাকে দিয়েছে উড়িয়ে,
রোদকে ডেকেছে নন্দনবন পৃথিবীর
বৈশাখী ঝড় দিয়েছে বরফ গুঁড়িয়ে।

সুন্দর মুখ কঠোর করেছে কাশ্মীর
তীক্ষ্ণ চাহনি সূর্যের উত্তাপে,
গলিত বরফে জীবনের স্পন্দন
শ্যামল মাটির স্পর্শেও আজ কাঁপে।

সাগর-বাতাসে উড়ছে আজ ওর চুল
শাল দেবদারু পাইনের বনে ক্ষোভ,
ঝড়ের পক্ষে চূড়ান্ত সম্মতি—
কাশ্মীর নয়, জমাট বাঁধা বরফ।

কঠোর গ্রীষ্মে সূর্যোত্তাপে জাগা—
কাশ্মীর আজ চঞ্চল-স্রোত লক্ষ ;
দিগ্‌দিগন্তে ছুটে ছুটে চলে দুর্বার
দুঃসহ ক্রোধে ফুলে ফুলে ওঠে বক্ষ।

ক্ষুব্ধ হাওয়ায় উদ্দাম উঁচু কাশ্মীর
কালবোশেখীর পতাকা উড়ছে নভে,
দুলে দুলে ওঠে ঘুমন্ত হিমালয়
বহু যুগ পরে বুঝি জাগ্রত হবে ॥

সিগারেট

আমরা সিগারেট।
তোমরা আমাদের বাঁচতে দাও না কেন ?
আমাদের কেন নিঃশেষ করো পুড়িয়ে ?
কেন এত স্বল্প-স্থায়ী আমাদের আয়ু ?
মানবতার কোন্ দোহাই তোমরা পাড়বে ?

আমাদের দাম বড় কম এই পৃথিবীতে।
তাই কি তোমরা আমাদের শোষণ করো ?
বিলাসের সামগ্রী হিসাবে ফেল পুড়িয়ে ?
তোমাদের শোষণের টানে আমরা ছাই হই :
তোমরা নিবিড় হও আরামের উত্তাপে।

তোমাদের আরাম : আমাদের মৃত্যু !
এমনি ক'রে চলবে আর কত কাল ?
আর কতকাল আমরা এমন নিঃশব্দে ডাকব
আয়ু-হরণকারী তিল তিল অপঘাতকে ?

দিন আর রাত্রি—রাত্রি আর দিন ;
তোমরা আমাদের শোষণ করছ সর্বক্ষণ—
আমাদের বিশ্রাম নেই, মজুরি নেই—
নেই কোনো অল্প-মাত্রার ছুটি ।

তাই, আর নয় ;
আর আমরা বন্দী থাকব না
কৌটোয় আর প্যাকেটে
আঙুলে আর পকেটে ;
সোনা-বাঁধানো 'কেসে' আমাদের নিঃশ্বাস হবে না রুদ্ধ ।
আমরা বেরিয়ে পড়ব,
সবাই একজোটে, একত্রে—
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিট্‌কে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে ;
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের মেরেছ এতকাল ॥

দেশলাই কাঠি

আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি
এত নগণ্য, হয়তো চোখেও পড়ি না :
তবু জেনো
মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—
বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস ;
আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি।

মনে আছে সেদিন হুলুস্থূল বেধেছিল ?
ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন—
আমাকে অবজ্ঞাভরে না-নিভিয়ে ছুড়ে ফেলায় !
কত ঘরকে দিয়েছি পুড়িয়ে,
কত প্রাসাদকে করেছি ধূলিসাৎ ;
আমি একাই—ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি।

এমনি বহু নগর, বহু রাজ্যকে দিতে পারি ছারখার করে।
তবুও অবজ্ঞা করবে আমাদের ?
মনে নেই ? এই সেদিন—
আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাক্সে ;
চমকে উঠেছিলে—
আমরা শুনেছিলাম তোমাদের বিবর্ণ মুখের আর্তনাদ !

আমাদের কী অসীম শক্তি
তা তো অনুভব করেছ বারংবার ;
তবু কেন বোঝ না,
আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে,

আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে।
আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—
তা তো তোমরা জানোই!
কিন্তু তোমরা তো জানো না :
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই - শেষবারের মতো।

বিবৃতি

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ
রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ ;
বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দুপাশে,
প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন
নিঃশব্দে ঘোষণা করে দারুণ দুর্দিন,
পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দরমহলে।

দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,
নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অন্তিম সম্বল ;
রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,
বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে।

পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু আক্রমণ করে,
বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়ে,
নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসন,
ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকটনাশন।
সহসা অনেক রাত্রে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে
দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে

তবুও প্রতিজ্ঞা ফেরে বাতাসে নিভৃত,
এখানে চল্লিশ কোটি এখনো জীবিত,
ভারতবর্ষের 'পরে গলিত সূর্য ঝরে আজ—
দিগ্বিদিকে উঠেছে আওয়াজ,
রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল
উদ্ধত প্রাণের বেগে উন্মুখর আমার এদেশ,
আমার বিধ্বস্ত প্রাণে দৃঢ়তার এসেছে নির্দেশ।

আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐকতান।
অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে

আজকে আসন্ন মুক্তি দূর থেকে দৃষ্টি দেয় শ্যেন,
এদেশে ভাণ্ডার ভ'রে দেবে জানি নতুন য়ুক্রেন।

নিরন্ন আমার দেশে আজ তাই উদ্ধত জেহাদ,
টলোমলো এ দুর্দিন, থরোথরো জীর্ণ বনিয়াদ।
তাইতো রক্তের স্রোতে শুনি পদধ্বনি
বিক্ষুব্ধ টাইফুন-মত্ত চঞ্চল ধমনী :
বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা॥

চিল

পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম :
ফুটপাতে এক মরা চিল!

চমকে উঠলাম ওর করুণ বীভৎস মূর্তি দেখে।
অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে,
লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ ;
যার শ্যেন দৃষ্টিতে কেবল ছিল
তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি—
তাকে দেখলাম, ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে।

গম্বুজশিখরে বাস করত এই চিল,
নিজেকে জাহির করত সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে ;
হালকা হাওয়ায় ডানা মেলে দিত আকাশের-নীলে,—
অনেককে ছাড়িয়ে ; একক :
পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে।

অনেকে আজ নিরাপদ ;
নিরাপদ ইঁদুর ছানারা আর খাদ্য-হাতে ত্রস্ত পথচারী,
নিরাপদ—কারণ আজ সে মৃত।
আজ আর কেউ নেই ছোঁ মারার,
ওরই ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো
ও পড়ে রইল ফুটপাতে,
শুক্‌নো, শীতল, বিকৃত দেহে।

হাতে যাদের ছিল প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা—
তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে ;
নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে
আকাশচ্যুত এক উদ্ধত চিলকে ॥

চট্টগ্রাম : ১৯৪৩

ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম—
চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম !
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎপ্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন।
চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম !
এখনো নিস্তব্ধ তুমি
তাই আজো পাশবিকতার
দুঃসহ মহড়া চলে,
তাই আজো শত্রুরা সাহসী।
জানি আমি তোমার হৃদয়ে
অজস্র ঔদার্য আছে ; জানি আছে সুস্থ শালীনতা
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে
এখনও স্তিমিত নও, জানি তুমি এখনো উদ্দাম—
হে চট্টগ্রাম !

তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দুলের ঘুম
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
তোমার উদ্যত থাবা, সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
এখনো হয় নি নিরাপদ।
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।

তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম!
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম॥

মধ্যবিত্ত '৪২

পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে,
আজকে সকলে ভুগছে একযোগে,
এখানে খানিক তারই পূর্বাভাষ
পাচ্ছি, এখন বইছে পুব-বাতাস।
উপায় নেই যে সামলে ধরব হাল,
হিংস্র বাতাসে ছিঁড়ল আজকে পাল।
গোপনে আগুন বাড়ছে ধানক্ষেতে,
বিদেশী খবরে রেখেছি কান পেতে,
সভয়ে এদেশে কাটছে রাত্রিদিন,
লুব্ধ বাজারে রুগ্ন স্বপ্নহীন।
সহসা নেতারা রুদ্ধ—দেশ জুড়ে
'দেশপ্রেমিক' উদিত ভুঁই ফুঁড়ে।
প্রথমে তাদের অন্ধ বীর মদে
মেতেছি এবং ঠকেছি প্রতিপদে;
দেখেছি সুবিধা নেই এ কাজ করায়
একক চেষ্টা কেবলই ভুল ধরায়।

এদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে
আবার বোমারু রক্ত পান করে,
ক্ষুব্ধ জনতা আসামে, চাটগাঁয়ে,
শাণিত দ্বৈত নগ্ন অন্যায়ে ;
তাদের স্বার্থ আমার স্বার্থকে,
দেখছে চেতনা আজকে এক চোখে ॥

সেপ্টেম্বর '৪৬

কলকাতায় শান্তি নেই।
রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে
প্রতিটি সন্ধ্যায়।
হৃৎস্পন্দনধ্বনি দ্রুত হয় :
মূর্ছিত শহর
এখন গ্রামের মতো
সন্ধ্যা হলে জনহীন নগরের পথ :
স্তম্ভিত আলোকস্তম্ভ
আলো দেয় নিতান্ত সভয়ে।
কোথায় দোকানপাট ?
কই সেই জনতার স্রোত ?
সন্ধ্যার আলোর বন্যা
আজ আর তোলে নাকো
জনতরণীর পাল
শহরের পথে।

ট্রাম নেই, বাস নেই -
সাহসী পথিকহীন
এ শহর আতঙ্ক ছড়ায়।
সারি সারি বাড়ি সব
মনে হয় কবরের মতো,
মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে আছে
চুপ ক'রে সভয়ে নির্জনে।
মাঝে মাঝে শব্দ হয়!
মিলিটারী লরীর গর্জন
পথ বেয়ে ছুটে যায় বিদ্যুতের মতো
সদম্ভ আক্রোশে।
কলঙ্কিত কালো কালো রক্তের মতন
অন্ধকার হানা দেয় অতন্দ্র শহরে ;
হয়তো অনেক রাত্রে
পথচারী কুকুরের দল
মানুষের দেখাদেখি
স্বজাতিকে দেখে
আস্ফালন, আক্রমণ করে।
রুদ্ধশ্বাস এ শহর
ছটফট করে সারা রাত -
কখন সকাল হবে ?
জীয়নকাঠির স্পর্শ
পাওয়া যাবে উজ্জ্বল রোদ্দুরে ?
সন্ধ্যা থেকে প্রত্যুষের দীর্ঘকাল
প্রহরে প্রহরে
সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ঘড়ির ঘণ্টায়

ধৈর্যহীন শহরের প্রাণ :
এর চেয়ে ছুরি কি নিষ্ঠুর ?
বাদুড়ের মতো কালো অন্ধকার
ভর ক'রে গুজবের ডানা
উৎকর্ণ কানের কাছে
সারা রাত ঘুরপাক খায়।
স্তব্ধতা কাঁপিয়ে দিয়ে
কখনো বা গৃহস্থের দ্বারে
উদ্ধত, অটল আর সুগম্ভীর
শব্দ ওঠে কঠিন বুটের।

শহর মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

জুলাই! জুলাই! আবার আসুক ফিরে
আজকের কলকাতার এ প্রার্থনা ;
দিকে দিকে শুধু মিছিলের কোলাহল—
এখনো পায়ের শব্দ যাচ্ছে শোনা।

অক্টোবরকে জুলাই হতেই হবে
আবার সবাই দাঁড়াব সবার পাশে,
আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে॥

ঐতিহাসিক

আজ এসেছি তোমাদের ঘরে ঘরে—
পৃথিবীর আদালতের পরোয়ানা নিয়ে
তোমরা কি দেবে আমার প্রশ্নের কৈফিয়ৎ :
কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল ?
আজ বাহান্ন সালের সূচনায় কি তার উত্তর দেবে ?
জানি ! স্তব্ধ হয়ে গেছে তোমাদের অগ্রগতির স্রোত,
তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছ ভবিষ্যৎ
আর অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।
কিন্তু ভেবে দেখেছ কি ?
দেরি হয়ে গেছে অনেক, অনেক দেরি !
লাইনে দাঁড়ান অভ্যেস কর নি কোনোদিন,
একটি মাত্র লক্ষ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
মারামারি করেছ পরস্পর,
তোমাদের ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা দেখে
বন্ধ হয়ে গেছে মুক্তির দোকানের ঝাঁপ।
কেবল বঞ্চিত বিহ্বল বিমূঢ় জিজ্ঞাসাভরা চোখে
প্রত্যেকে চেয়েছ প্রত্যেকের দিকে :
— কেন এমন হল ?

একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।

চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন ?
এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের অন্য চাই লাইন।
কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন
মূর্খ তোমরা
লাইন দিলে : কিন্তু মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু,
রক্তক্ষয়ের বদলে পেলে প্রবঞ্চনা।
ইতিমধ্যে তোমাদের বিবদমান বিশৃঙ্খল ভিড়ে
মুক্তি উঁকি দিয়ে গেছে বহুবার।

লাইনে দাঁড়ান আয়ত্ত করেছে যারা,
সোভিয়েট, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স
রক্তমূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেল তাদের মুক্তি
সব প্রথম এই পৃথিবীর দোকান থেকে।
এখনো এই লাইনে অনেকে প্রতীক্ষমান,
প্রার্থী অনেক ; কিন্তু পরিমিত মুক্তি।
হয়তো এই বিশ্বব্যাপী লাইনের শেষে
এখনো তোমাদের স্থান হতে পারে—
এ কথা ঘোষণা ক'রে দাও তোমাদের দেশময়
প্রতিবেশীর কাছে।
তারপর নিঃশব্দে দাঁড়াও এ লাইনে প্রতিজ্ঞা
আর প্রতীক্ষা নিয়ে
হাতের মুঠোয় তৈরী রেখে প্রত্যেকের প্রাণ।
আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো,
মনে রেখো, দেরি হয়ে গেছে, অনেক অনেক দেরি।

আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন ॥

শত্রু এক

এদেশ বিপন্ন আজ ; জানি আজ নিরন্ন জীবন—
মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
রক্তের আল্পনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদ সুর ;
তবুও সুদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু : এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।
কঠিন প্রতিজ্ঞা-স্তব্ধ আমাদের দৃপ্ত কারখানায়,
প্রত্যেক নির্বাক যন্ত্র প্রতিরোধ সংকল্প জানায়।
আমার হাতের স্পর্শে প্রতিদিন যন্ত্রের গর্জন
স্মরণ করায় পণ ; অবসাদ দিই বিসর্জন।
বিক্ষুব্ধ যন্ত্রের বুকে প্রতিদিন যে যুদ্ধ ঘোষণা,
সে যুদ্ধ আমার যুদ্ধ, তারই পথে স্তব্ধ দিন গোনা।
অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্র দিন, জয়োন্মত্ত পাখা—
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা।
আমার বেগান্ধ হাত, অবিরাম যন্ত্রের প্রসব
প্রচুর প্রচুর সৃষ্টি, শেষ বজ্র সৃষ্টির উৎসব ॥

মজুরদের ঝড়

(ল্যাংস্টন হিউজ)

এখন এই তো সময়—
কই ? কোথায় ? বেরিয়ে এসো ধর্মঘটভাঙা দালালরা ;
সেই সব দালালরা—
ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদলায়,
বেরিয়ে এসো !
জাহান্নমে যাওয়া মূর্খের দল,
বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য
পরাজয় আর মৃত্যুর দূত—
বেরিয়ে এসো !
বেরিয়ে এসো শক্তিমান আর অর্থলোভীর দল
সংকীর্ণ গলির বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে।
গর্তের পোকারা !
এই তো তোমাদের শুভক্ষণ,
গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো—
আর বেরিয়ে পড়ো ছোট ছোট সাপেরা
বড় আর মোটা সাপেদের যারা ঘিরে থাকো।
সময় হয়েছে,
আসরফি আর পুরনো অপমানের বদলে
সাদা যাদের পেট—
বংশগত সরীসৃপ দাঁত তারা বের করুক,
এই তো তাদের সুযোগ।
মানুষ ভালো করেই জানে

অনেক মানুষের বিরুদ্ধে একজনকে লাগানোর সেই
পুরনো কায়দা।

সামান্য কয়েকজন লোভী
অনেক অভাবীর বিরুদ্ধে—
আর স্বাস্থ্যবানদের বিরুদ্ধে
ক্ষয়ে-যাওয়ার দল।
সূর্যালোকের পথে যাদের যাত্রা
তাদের বিরুদ্ধে তাই সাপেরা।

অতীতে অবশ্য এই সাপেরা জিতেছে বহুবার।

কিন্তু এখন সেই সময়,
সচেতন মানুষ! এখন আর ভুল ক'রো না—
বিশ্বাস ক'রো না সেই সব সাপেদের
জমকালো চামড়ায় যারা নিজেদের ঢেকে রাখে,
বিপদে পড়লে যারা ডাকে
তাদের চেয়ে কম চটকদার বিষাক্ত অনুচরদের।
এতটুকু লজ্জা হয় না তাদের ধর্মঘট ভাঙতে
যে ধর্মঘট বেআব্রু ক্ষুধার চূড়ান্ত চিহ্ন।

—অবশ্য, এখনো কোনো সম্মানিত প্রতিষ্ঠান হয় নি
যার অজ্ঞাত নাম:
"ধর্মঘট ভাঙার দল"
অন্তত দরজায় সে নাম লেখা থাকে না।

ঝড় আসছে—সেই ঝড়:
যে ঝড় পৃথিবীর বুক থেকে জঞ্জালদের টেনে তুলবে।
আর হুঁশিয়ার মজুর :
সে ঝড় প্রায় মুখোমুখি॥

ডাক

মুখে-মৃদু-হাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাই না। ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধে বুকে, উদ্ধত তবু মাথা—
হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা,
শোনো, হুঙ্কার কোটি অবরুদ্ধের।

দুর্ভিক্ষকে তাড়াও, ওদেরও তাড়াও—
সন্ধিপত্র মাড়াও, দুপায়ে মাড়াও।
তিন-পতাকার মিনতি : দেবে না সাড়াও ?
অসহ্য জ্বালা কোটি কোটি ক্রুদ্ধের।

ক্ষতবিক্ষত নতুন সকাল বেলা,
শেষ করব এ রক্তের হোলিখেলা,
ওঠো সোজা হয়ে, পায়ে পায়ে লাগে ঠেলা
দেখ, ভিড় দেখ স্বাধীনতালুব্ধের।

ফাল্গুন মাস, ঝরুক জীর্ণ পাতা
গজাক নতুন পাতারা, তুলুক মাথা,
নতুন দেয়াল দিকে দিকে হোক গাঁথা—
জাগে বিক্ষোভ চারিপাশে ক্ষুব্ধের।

হ্রদে তৃষ্ণার জল পাবে কত কাল ?
সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তাল ;
তুমি কোন্ দলে ? জিজ্ঞাসা উদ্দাম :
'গুণ্ডা'র দলে আজো লেখাও নি নাম ?

বোধন

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার ;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি ;
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,

ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো

ব্যাহত জীবনযাত্রা চুপি চুপি কান্না বও বুকে,
হে নীড়-বিহারী সঙ্গী! আজ শুধু মনে মনে ধুঁকে
ভেবেছ সংসারসিন্ধু কোনোমতে হয়ে যাবে পার
পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।
তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি ক'রে যারা গুপ্তকক্ষতে জমায়
তাদেরি দুপায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায়;
লোভের পাপের দুর্গ গম্বুজ ও প্রাসাদে মিনারে
তুমি যে পেতেছ হাত; আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বারংবার হবে তা নিষ্ফল—
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।
তুমি তো প্রহর গোনো,
তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি,
তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ; শূন্য মাঠে কঙ্কাল-করোটি
তোমাকে বিদ্রূপ করে, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে—
কুজ্ঝটি তোমার চোখে, তুমি ঘুরে ফেরো দুর্বিপাকে।

পৃথিবী উদাস, শোনো হে দুনিয়াদার!
সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু কালো পাহাড়
দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পার:

কি করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার—
এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার ?

লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি ; উজাড় গ্রাম ।
সুদ ও আসলে আজকে তাই
যুদ্ধশেষের প্রাপ্য চাই ।

কৃপণ পৃথিবী, লোভের অস্ত্র
দিয়ে কেড়ে নেয় অন্নবস্ত্র,
লোলুপ রসনা মেলা পৃথিবীতে
বাড়াও ও-হাত তাকে ছিঁড়ে নিতে ।
লোভের মাথায় পদাঘাত হানো—
আনো, রক্তের ভাগীরথী আনো ।
দৈত্যরাজের যত অনুচর
মৃত্যুর ফাঁদ পাতে পর পর ;
মেলো চোখ আজ, ভাঙো সে ফাঁদ—
হাঁকো দিকে দিকে সিংহনাদ ।
তোমার ফসল, তোমার মাটি
তাদের জীয়ন ও মরণকাঠি
তোমার চেতনা চালিত হাতে ।
এখনও কাঁপবে আশঙ্কাতে ?
স্বদেশপ্রেমের ব্যাঙ্গমা পাখি
মারণমন্ত্র বলে, শোনো তা কি ?
এখনো কি তুমি আমি স্বতন্ত্র ?
করো আবৃত্তি, হাঁকো সে মন্ত্র :

শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার !
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার ?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।
তারপর বহুশত যুগ পরে
ভবিষ্যতের কোনো যাদুঘরে
নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।
তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
মানুষ ছিল কি ? জবাব মেলে না তার।

আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়,
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড় ;
আজকের নৈঃশব্দ্য হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।

দুহাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,
প্রার্থনা করো :

হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার-গলানো উত্তাপ।
টুক্‌রো টুকরো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

তা যদি না হয়, মাথার উপরে ভয়ঙ্কর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর ;
তা যদি না হয়, বুঝব তুমি তো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয় নি জল
দেয় নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেইকো ঠাঁই ॥

রানার

রানার ছুটেছে তাই ঝুম্‌ঝুম্‌ ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে, রানার !
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

রানার ! রানার !
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে, চিঠি আর সংবাদে ;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে স'রে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্‌ ক'রে চায় ;
কেমন ক'রে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায় !
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্‌, জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার ! এখনো রাতের কালো।

এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'।

ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,—
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা ব'য়ে?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে -আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;

শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার ॥

মৃত্যুঞ্জয়ী গান

নিয়ত দক্ষিণ হাওয়া স্তব্ধ হল একদা সন্ধ্যায়
অজ্ঞাতবাসের শেষে নিদ্রাভঙ্গে নির্বীর্য জনতা
সহসা আরণ্য রাজ্যে স্তম্ভিত সভয়ে ;
নির্বায়ুমণ্ডল ক্রমে দুর্ভাবনা দৃঢ়তর করে।
দূরাগত স্বপ্নের কী দুর্দিন ! মহামারী অন্তরে বিক্ষোভ
সঞ্চারিত রক্তবেগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে :
অবসন্ন বিলাসের সঙ্কুচিত প্রাণ।

বণিকের চোখে আজ কী দুরন্ত লোভ ঝ'রে পড়ে :
মুহুর্মুহু রক্তপাতে স্বধর্ম সূচনা ;
ক্ষয়িষ্ণু দিনেরা কাঁদে অনর্থক প্রসব ব্যথায়।
নশ্বর পৌষদিন, চারিদিকে ধূর্তের সমতা
জটিল আবর্তে শুধু নৈমিত্তিক প্রাণের স্পন্দন :

শোকাচ্ছন্ন আমাদের সনাতন মন
পৃথিবীর সম্ভাবিত অকাল মৃত্যুতে।
দুর্দিনের সমন্বয়, সম্মুখেতে অনন্ত প্রহর—
দৃষ্টিপথ অন্ধকার, সন্দিহান আগামী দিনেরা!
গলিত উদ্যম তাই বৈরাগ্যের ভান,
কণ্টকিত প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্যবাসর।

সহসা জানলায় দেখি দুর্ভিক্ষের স্রোতে
জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ—
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র পর্বতে;
সে মিছিলে শোনা গেল
জনতার মৃত্যুজয়ী গান॥

কনভয়

হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল
যুদ্ধফেরত এক কনভয়:
ক্ষেপে-ওঠা পঙ্গপালের মতো
রাজপথ সচকিত ক'রে।
আগে আগে কামান উঁচিয়ে,
পেছনে নিয়ে খাদ্য আর রসদের সম্ভার

ইতিহাসের ছাত্র আমি,
জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম

ইতিহাসেরই দিকে।
সেখানেও দেখি উন্মত্ত এক কনভয়
ছুটে আসছে যুগযুগান্তের রাজপথ বেয়ে।
সামনে ধূমউদ্গীরণরত কামান,
পেছনে খাদ্যশস্য আঁকড়ে-ধরা জনতা—
কামানের ধোঁয়ার আড়ালে আড়ালে দেখলাম,
মানুষ।
আর দেখলাম ফসলের প্রতি তাদের পুরুষানুক্রমিক
মমতা।
অনেক যুগ, অনেক অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র পেরিয়ে
তারা এগিয়ে আসছে : ঝল্‌সানো কঠোর মুখে।

ফসলের ডাক : ১৩৫১

কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।

শক্তির উন্মুক্ত হাওয়া আমার পেশীতে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি চেতনার বিদ্যুৎ বিকাশ :
দুপায়ে অস্থির আজ বলিষ্ঠ কদম্ :
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

দুচোখে আমার আজ বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন,
নিঃশব্দে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার

মৌশুমী হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক :
শহরের চুল্লী ঘিরে পতঙ্গের কানে।

বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে,
মাঠে মাঠে আমাদের ছড়ানো সম্পদ ;
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।
মনে আছে একদিন তোমাদের ঘরে
নবান্ন উজাড় ক'রে পাঠিয়েছি সোনার বছরে,
নির্ভাবনার হাসি ছড়িয়েছি মুখে
তৃপ্তির প্রগাঢ় চিহ্ন এনেছি সম্মুখে,
সেদিনের অলক্ষ সেবার বিনিময়ে
আজ শুধু কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্যপ্রখর—
যে কাস্তে ঝল্‌সাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।

জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে,
দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভাণ্ডারে ;
তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,
শুধু আজ কাস্তে দাও আমার এ হাতে

পরাস্ত অনেক চাষী ; ক্ষিপ্রগতি নিঃশব্দ মরণ —
জ্বলন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষুর আত্মসমর্পণ,
তাদের ফসল প'ড়ে, দৃষ্টি জ্বলে সুদূরসন্ধানী

তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপি চুপি করে কানাকানি—
আমাকেই কাস্তে নিতে হবে।
নিযুত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার যন্ত্রণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,
সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত :

তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে॥

কৃষকের গান

এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে
এইবার ফলাব ফসল—
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন।
এ মাটির গর্ভে আজ আমি
দেখেছি আসন্ন জন্মেরা
ক্রমশ সুপুষ্ট ইঙ্গিতে :
দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর।
আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি ?
(গোপন একান্ত এক পণ)
এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন-ফসল।
ঘনায় ভাঙন দুই চোখে
ধ্বংসস্রোত জনতা জীবনে ;

আমার প্রতিজ্ঞা গ'ড়ে তোলে
ক্ষুধিত সহস্র হাতছানি।
দুয়ারে শত্রুর হানা
মুঠিতে আমার দুঃসাহস।
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ॥

এই নবান্নে

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান—
পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।
তবুও এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায়:
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়:
গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,
পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন;
নিজের হাতের জমি ধান-বোনা
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা,
কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসে নি শুভক্ষণ—
তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।

এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,

পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বচন—
এই হেমন্তে ফসলেরা বলে : কোথায় আপনজন
তারা কি কেবল লুকোনো থাকবে,
অক্ষমতার গ্লানিকে ঢাকবে,
প্রাণের বদলে যারা প্রতিবাদ করেছে উচ্চারণ ?

এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ ?

আঠারো বছর বয়স

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত : একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে

হে মহাজীবন

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো !
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা--
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি ॥

ঘুমনেই

বিক্ষোভ

দৃঢ় সত্যের দিতে হবে খাঁটি দাম,
হে স্বদেশ, ফের সেই কথা জানলাম।
জানে না তো কেউ পৃথিবী উঠছে কেঁপে
ধরেছে মিথ্যে সত্যের টুঁটি চেপে,
কখনো কেউ কি ভূমিকম্পের আগে
হাতে শাঁখ নেয়, হঠাৎ সবাই জাগে ?
যারা আজ এত মিথ্যার দায়ভাগী,
আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।
ইতিহাস, জানি নীরব সাক্ষী তুমি,
আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশভূমি,
অনেকে বিদ্রূপ, কানে দেয় হাত চাপা,
তাতেই কি হয় আসল নকল মাপা ?
বিদ্রোহী মন ! আজকে ক'রো না মানা,
দেব প্রেম আর পাব কলসীর কাণা,
দেব, প্রাণ দেব মুক্তির কোলাহলে,
জীন্ ডার্ক, যীশু, সোক্রাটিসের দলে।
কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল,
ততদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।
ইতিহাস ! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ ॥

১লা মে-র কবিতা '৪৬

লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায় ?
কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে ?
মনের কথা ব্যক্ত করবে
ক্ষীণ অস্পষ্ট কেঁউ-কেঁউ শব্দে ?
ক্ষুধিত পেটে ধুঁকে ধুঁকে চলবে কত দিন ?
ঝুলে পড়া তোমার জিভ,
শ্বাসে প্রশ্বাসে ক্লান্তি টেনে কাঁপতে থাকবে কত কাল ?
মাথায় মৃদু চাপড় আর পিঠে হাতের স্পর্শে
কতক্ষণ ভুলে থাকবে পেটের ক্ষুধা আর গলার শিকলকে ?
কতক্ষণ নাড়তে থাকবে লেজ ?

তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝল্‌সানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে॥

পরিখা

স্বচ্ছ রাত্রি এনেছে প্লাবন, উষ্ণ নিবিড়
ধূলিদাপটের মরুচ্ছায়ায় ঘনায় নীল।
ক্লান্ত বুকের হৃৎস্পন্দন ক্রমেই ধীর
হয়ে আসে তাই শেষ সম্বল তোলো পাঁচিল।
ক্ষণভঙ্গুর জীবনের এই নির্বিরোধ
হতাশা নিয়েই নিত্য তোমার দাদন শোধ ?

শ্রান্ত দেহ কি ভীরু বেদনার অন্ধকূপে
ডুবে যেতে কাঁদে মুক্তিমায়ায় ইতস্তত ;
কত শিখণ্ডী জন্ম নিয়েছে নূতন রূপে ?
দুঃস্বপ্নের প্রায়শ্চিত্ত চোরের মতো।
মৃত ইতিহাস অশুচি ঘুচায় ফল্গু-স্নানে ;
গন্ধবিধুর রুধির তবুও জোয়ার আনে।

পথবিভ্রম হয়েছে এবার, আসন্ন মেঘ।
চলে ক্যারাভান ধূসর আঁধারে অন্ধগতি,
সরীসৃপের পথ চলা শুরু প্রমত্ত বেগ
জীবন্ত প্রাণ, বিবর্ণ চোখে অসম্মতি।
অরণ্য মাঝে দাবদাহ কিছু যায় না রেখে
মনকে বাঁচাও বিপন্ন এই মৃত্যু থেকে।

সঙ্গীবিহীন দুর্জয় এই পরিভ্রমণ
রক্তনেশায় এনেছে কেবলই সুখাস্বাদ,
এইবার করো মেরুদুর্গম পরিখা খনন
বাইরে চলুক অযথা অধীর মুক্তিবাদ।

দুর্গম পথে যাত্রী সওয়ার ভ্রান্তিবিহীন
ফুরিয়ে এসেছে তন্দ্রানিঝুম ঘুমন্ত দিন।

পালাবে বন্ধু? পিছনে তোমার ধূমন্ত ঝড়
পথ নির্জন, রাত্রি বিছানো অন্ধকারে।
চলো, আরো দূরে? ক্ষুধিত মরণ নিরন্তর,
পুরনো পৃথিবী জেগেছে আবার মৃত্যুপারে,
অহেতুক তাই হয় নি তোমার পরিখা খনন,
থেমে আসে আজ বিড়ম্বনায় শ্রান্ত চরণ।

মরণের আজ সর্পিল গতি বক্রবধির—
পিছনে ঝটিকা, সামনে মৃত্যু রক্তলোলুপ।
বারুদের ধূম কালো ছায়া আনে,—তিক্ত রুধির;
পৃথিবী এখনো নির্জন নয়,—জ্বলন্ত ধূপ।
নৈঃশব্দ্যের তীরে তীরে আজ প্রতীক্ষাতে
সহস্র প্রাণ বসে আছে ঘিরে অস্ত্র হাতে॥

সব্যসাচী

অভুক্ত শ্বাপদচক্ষু নিঃস্পন্দ আঁধারে
জ্বলে রাত্রিদিন।
হে বন্ধু, পশ্চাতে ফেলি অন্ধ হিমগিরি
অনন্ত বার্ধক্য তব ফেলুক নিঃশ্বাস;

রক্তলিপ্ত যৌবনের অন্তিম পিপাসা
নিষ্ঠুর গর্জনে আজ অরণ্য ধোঁয়ায়
উঠুক প্রজ্বলি'।
সপ্তরথী শোনে নাকো পৃথিবীর শৈশবক্রন্দন,
দেখে নাই নির্বাকের অশ্রুহীন জ্বালা।
দ্বিধাহীন চণ্ডালের নির্লিপ্ত আদেশে
আদিম কুক্কুর চাহে
ধরণীর বস্ত্র কেড়ে নিতে।
উল্লাসে লেলিহজিহ্ব লুব্ধ হায়েনারা—
তবু কেন কঠিন ইস্পাত ?
জরাগ্রস্ত সভ্যতার হৃৎপিণ্ড জর্জর,
ক্ষুৎপিপাসা চক্ষু মেলে
মরণের উপসর্গ যেন।
স্বপ্নলব্ধ উদ্যমের অদৃশ্য জোয়ারে
সংঘবদ্ধ বল্মীকের দল।

নেমে এসো— হে ফাল্গুনী,
বৈশাখের খরতপ্ত তেজে
ক্লান্ত ভুবাহু তব লৌহময় হোক
বয়ে যাক শোণিতের মন্দাকিনী স্রোত ;
মুমূর্ষু পৃথিবী উষ্ণ, নিত্য তৃষাতুরা,
নির্বাপিত আগ্নেয় পর্বত
ফিরে চায় অনর্গল বিলুপ্ত আতপ।
আজ কেন সুবর্ণ শৃঙ্খলে
বাঁধা তব রিক্ত বজ্রপাণি,
তুষারের তলে সুপ্ত অবসন্ন প্রাণ ?

তুমি শুধু নহ সব্যসাচী,
বিস্মৃতির অন্ধকার পারে
ধূসর গৈরিক নিত্য প্রান্তহীন বেলাভূমি 'পরে
আত্মভোলা, তুমি ধনঞ্জয়।

উদ্বীক্ষণ

নগরে ও গ্রামে জমেছে ভিড়
ভগ্ননীড়,—
ক্ষুধিত জনতা আজ নিবিড়।
সমুদ্রে জাগে বাড়বানল,
কী উচ্ছল,
তীরসন্ধানী ব্যাকুল জল।
কখনো হিংস্র নিবিড় শোকে,
দাঁতে ও নখে—
জাগে প্রতিজ্ঞা অন্ধ চোখে।
তবু সমুদ্র সীমানা রাখে,
দুর্বিপাকে
দিগন্তব্যাপী প্লাবন ঢাকে।
আসন্ন ঝড়ে অরণ্যময়
যে বিস্ময়
ছড়াবে, তার কি অযথা ক্ষয় ?
দেশে ও বিদেশে লাগে জোয়ার,
ঘোড়সোয়ার

চিনে নেবে পথ দৃঢ় লোহার,
যে পথে নিত্য সূর্যোদয়
আনে প্রলয়,
সেই সীমান্তে বাতাস বয় ;
তাই প্রতীক্ষা—ঘনায় দিন
স্বপ্নহীন ॥

বিদ্রোহের গান

বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি ?
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী
উঠুক ডাক।

উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরিবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌঁছোক দ্বারে ;
ভীরুরা থাক।

মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি,
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখবে কে আর এ অগ্রগতি,
সাধ্য কার ?

রুটি দেবে নাকো ? দেবে না অন্ন ?
এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন ?
চোখ-রাঙানিকে করি না গণ্য
ধারি না ধার।

খ্যাতির মুখেতে পদাঘাত করি,
গড়ি, আমরা যে বিদ্রোহ গড়ি,
ছিঁড়ি দুহাতের শৃঙ্খলদড়ি,
মৃত্যুপণ।

দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্বকোণ।

ছিঁড়ি, গোলামির দলিলকে ছিঁড়ি,
বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়ি
খুঁজি কোনখানে স্বর্গের সিঁড়ি,
কোথায় প্রাণ !

দেখব, ওপরে আজো আছে কারা,
খসাব আঘাতে আকাশের তারা,
সারা দুনিয়াকে দেব শেষ নাড়া,
ছড়াব ধান।
জানি রক্তের পেছনে ডাকবে সুখের বান ॥

অনন্যোপায়

অনেক গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ বহু উদ্যম আমার,
নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, তাঁতী ঘরে, নিঃশব্দ কামার,
অর্ধেক প্রাসাদ তৈরী, বন্ধ ছাদ-পেটানোর গান,
চাষীর লাঙল ব্যর্থ, মাঠে নেই পরিপূর্ণ ধান।
যতবার গড়ে তুলি, ততবার চকিত বন্যায়
উদ্যত সৃষ্টিকে ভাঙে পৃথিবীতে অবাধ অন্যায়।
বার বার ব্যর্থ তাই আজ মনে এসেছে বিদ্রোহ,
নির্বিঘ্নে গড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেছে; ছিন্নভিন্ন মোহ।
আজকে ভাঙার স্বপ্ন,—অন্যায়ের দম্ভকে ভাঙার,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্য পথ দেখি নাকো আর।
তাইতো তন্দ্রাকে ভাঙি, ভাঙি জীর্ণ সংস্কারের খিল,
রুদ্ধ বন্দীকক্ষ ভেঙে মেলে দিই আকাশের নীল।
নির্বিঘ্ন সৃষ্টিকে চাও? তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে,
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে॥

অভিবাদন

হে সাথী, আজকে স্বপ্নের দিন গোনা
ব্যর্থ নয় তো, বিপুল সম্ভাবনা
দিকে দিকে উদ্‌যাপন করছে লগ্ন,
পৃথিবী সূর্য-তপস্যাতেই মগ্ন।

আজকে সামনে নিরুচ্চারিত প্রশ্ন,
মনের কোমল-মহল ঘিরে কবোষ্ণ ;
ক্রমশ পুষ্ট মিলিত উন্মাদনা,
ক্রমশ সফল স্বপ্নের দিন গোনা।

স্বপ্নের বীজ বপন করেছি সদ্য,
বিদ্যুৎবেগে ফসল সংঘবদ্ধ !
হে সাথী, ফসলে শুনেছো প্রাণের গান ?
দুরন্ত হাওয়া ছড়ায় ঐকতান।

বন্ধু, আজকে দোদুল্যমান পৃথ্বী,
আমরা গঠন করব নতুন ভিত্তি ;
তারই সূত্রপাতকে করেছি সাধন,
হে সাথী, আজকে রক্তিম অভিবাদন ॥

জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী

কত যুগ, কত বর্ষান্তের শেষে
জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী
আকাশে মেঘের তাড়াহুড়ো দিকে দিকে
বজ্রের কানাকানি।

সহসা ঘুমের তল্লাট ছেড়ে
শান্তি পালাল আজ।
দিন ও রাত্রি হল অস্থির
কাজ, আর শুধু কাজ!
জনসিংহের ক্ষুব্ধ নখর
হয়েছে তীক্ষ্ণ, হয়েছে প্রখর
ওঠে তার গর্জন—
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!
হাজার হাজার শহীদ ও বীর
স্বপ্নে নিবিড় স্মরণে গভীর
ভুলি নি তাদের আত্মবিসর্জন।
ঠোঁটে ঠোঁটে কাঁপে প্রতিজ্ঞা দুর্বোধ:
কানে বাজে শুধু শিকলের ঝন্‌ঝন্;
প্রশ্ন নয়কো পারা না পারার,
অত্যাচারীর রুদ্ধ কারার
দ্বার ভাঙা আজ পণ;
এতদিন ধ'রে শুনেছি কেবল শিকলের ঝন্‌ঝন্।
ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়,
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর;
ওদের স্মৃতিরা শিরায় শিরায়
কে আছে আজকে ওদের ফিরায়
কে ভাবে ওদের পর?
ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়!

নিদ্রায়, কাজকর্মের ফাঁকে
ওরা দিনরাত আমাদের ডাকে
ওদের ফিরাব কবে ?
কবে আমাদের বাহুর প্রতাপে
কোটি মানুষের দুর্বার চাপে
শৃঙ্খল গত হবে ?
কবে আমাদের প্রাণকোলাহলে
কোটি জনতার জোয়ারের জলে
ভেসে যাবে কারাগার !
কবে হবে ওরা দুঃখসাগর পার ?
মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি ;
ওরা আমাদের রক্ত দিয়েছে,
বদলে দুহাতে শিকল নিয়েছে
গোপনে করেছে ঋণী।
মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি !
হে খাতক নির্বোধ,
রক্ত দিয়েই সব ঋণ করো শোধ !
শোনো, পৃথিবীর মানুষেরা শোনো,
শোনো স্বদেশের ভাই,
রক্তের বিনিময় হয় হোক
আমরা ওদের চাই ॥

কবিতার খসড়া

আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়
ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়,
জানে না কেউ

উদ্যমহীন মূঢ় কারায়
পুরনো বুলির মাছি তাড়ায়
যারা, তারা নিয়ে ঘোরে পাড়ায়
স্মৃতির ফেউ ॥

আমরা এসেছি

কারা যেন আজ দুহাতে খুলেছে, ভেঙেছে খিল,
মিছিলে আমরা নিমগ্ন তাই দোলে মিছিল।
দুঃখ-যুগের ধারায় ধারায়
যারা আনে প্রাণ, যারা তা হারায়
তারাই ভরিয়ে তুলেছে সাড়ায় হৃদয়-বিল।
তারাই এসেছে মিছিলে, আজকে চলে মিছিল ॥

কে যেন ক্ষুব্ধ ভোমরার চাকে ছুঁড়েছে ঢিল,
তাইতো দগ্ধ, ভগ্ন, পুরনো পথ বাতিল।

আশ্বিন থেকে বৈশাখে যারা
হাওয়ার মতন ছুটে দিশেহারা,
হাতের স্পর্শে কাজ হয় সারা, কাঁপে নিখিল।
তারা এল আজ দুর্বারগতি চলে মিছিল॥

আজকে হালকা হাওয়ায় উড়ুক একক চিল,
জনতরঙ্গে আমরা ক্ষিপ্ত ঢেউ ফেনিল।
উধাও আলোর নিচে সমারোহ,
মিলিত প্রাণের একী বিদ্রোহ!
ফিরে তাকানোর নেই ভীরু মোহ, কী গতিশীল!
সবাই এসেছে, তুমি আসোনিকো, ডাকে মিছিল

একটি কথায় ব্যক্ত চেতনা : আকাশে নীল,
দৃষ্টি সেখানে তাইতো পদধ্বনিতে মিল।
সামনে মৃত্যুকবলিত দ্বার,
থাক অরণ্য, থাক না পাহাড়,
ব্যর্থ নোঙর, নদী হব পার, খুঁটি শিথিল।
আমরা এসেছি মিছিলে, গর্জে ওঠে মিছিল॥

একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬

আবার এবার দুর্বার সেই একুশে নভেম্বর—
আকাশের কোণে বিদ্যুৎ হেনে তুলে দিয়ে গেল
মৃত্যুকাঁপানো ঝড়।

আবার এদেশে মাঠে, ময়দানে
সুদূর গ্রামেও জনতার প্রাণে
হাসানাবাদের ইঙ্গিত হানে
প্রত্যাঘাতের স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
আবার এসেছে অবাধ্য এক একুশে নভেম্বর ॥

পিছনে রয়েছে একটি বছর, একটি পুরনো সাল,
ধর্মঘট আর চরম আঘাতে উদ্দাম, উত্তাল ;
বার বার জিতে, জানি অবশেষে একবার গেছি হেরে—
বিদেশী ! তোদের যাদুদণ্ডকে এবার নেবই কেড়ে।
শোন্ রে বিদেশী, শোন্,
আবার এসেছে লড়াই জেতার চরম শুভক্ষণ।
আমরা সবাই অসভ্য, বুনো—
বৃথা রক্তের শোধ নেব দুনো
একপা পিছিয়ে দু'পা এগোনোর
আমরা করেছি পণ,
ঠ'কে শিখলাম—
তাই তুলে ধরি দুর্জয় গর্জন।
আহ্বান আসে অনেক দূরের,
হায়দ্রাবাদ আর ত্রিবাঙ্কুরের ;
আজ প্রয়োজন একটি সুরের
একটি কঠোর স্বর :
"বিদেশী কুকুর ! আবার এসেছে একুশে নভেম্বর।"
ডাক ওঠে, ডাক ওঠে—
আবার কঠোর বহু হরতালে
আসে মিল্লাত, বিপ্লবী ডালে

এখানে সেখানে রক্তের ফুল ফোটে।
এ নভেম্বরে আবারো তো ডাক ওঠে॥

আমাদের নেই মৃত্যু এবং আমাদের নেই ক্ষয়,
অনেক রক্ত বৃথাই দিলুম
তবু বাঁচবার শপথ নিলুম
কেটে গেছে আজ রক্তদানের ভয়।
ল'ড়ে মরি তাই আমরা অমর, আমরাই অক্ষয়॥

আবার আসছে তেরোই ফেব্রুয়ারি,
দাঁতে দাঁত চেপে
হাতে হাত চেপে
উদ্যত সারি সারি,
কিছু না হলেও আবার আমরা
রক্ত দিতে তো পারি ?
পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফেব্রুয়ারি।
এ নভেম্বরে সংকেত পাই তারি॥

দিনবদলের পালা

আর এক যুদ্ধ শেষ,
পৃথিবীতে তবু কিছু জিজ্ঞাসা উন্মুখ।
উদ্দাম ঢাকের শব্দে

সে প্রশ্নের উত্তর কোথায় ?
বিজয়ী বিশ্বের চোখ মুদে আসে,
নামে এক ক্লান্তির জড়তা ।
রক্তাক্ত প্রান্তর তার অদৃশ্য দুহাতে
নাড়া দেয় পৃথিবীকে,
সে প্রশ্নের উত্তর কোথায় ?
তুষারখচিত মাঠে,
ট্রেঞ্চে, শূন্যে, অরণ্যে, পর্বতে
অস্থির বাতাস ঘোরে দুর্বোধ্য ধাঁধায়,
ভাঙা কামানের মুখে
ধ্বংসস্তূপে উৎকীর্ণ জিজ্ঞাসা :
কোথায় সে প্রশ্নের উত্তর ?

দিগ্বিজয়ী দুঃশাসন !
বহু দীর্ঘ দীর্ঘতর দিন
তুমি আছ দৃঢ় সিংহাসনে সমাসীন,
হাতে হিসেবের খাতা
উন্মুখর এ পৃথিবী :
আজ তার শোধ করো ঋণ ।
অনেক নিয়েছ রক্ত, দিয়েছ অনেক অত্যাচার,
আজ হোক তোমার বিচার ।
তুমি ভাব, তুমি শুধু নিতে পার প্রাণ,
তোমার সহায় আছে নিষ্ঠুর কামান ;
জানো নাকি আমাদেরও উষ্ণ বুক, রক্ত গাঢ় লাল,
পেছনে রয়েছে বিশ্ব, ইঙ্গিত দিয়েছে মহাকাল,
স্পীডোমিটারের মতো আমাদের হৃৎপিণ্ড উদ্দাম

প্রাণে গতিবেগ আনে, ছেয়ে ফেলে জনপদ—গ্রাম,
বুঝেছি সবাই আমরা আমাদের কী দুঃখ নিঃসীম,
দেখ ঘরে ঘরে আজ জেগে ওঠে এক এক ভীম।
তবুও যে তুমি আজো সিংহাসনে আছ
সে কেবল আমাদের বিরাট ক্ষমায়।
এখানে অরণ্য স্তব্ধ, প্রতীক্ষা-উৎকীর্ণ চারিদিক,
গঙ্গায় প্লাবন নেই, হিমালয় ধৈর্যের প্রতীক ;
এ সুযোগে খুলে দাও ক্রূর শাসনের প্রদর্শনী,
আমরা প্রহর শুধু গনি।

পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ, বন্ধ সৈনিকের রক্ত ঢালা :
ভেবেছ তোমার জয়, তোমার প্রাপ্য এ জয়মালা ;
জানো না এখানে যুদ্ধ—শুরু দিনবদলের পালা॥

মুক্ত বীরদের প্রতি

তোমরা এসেছ, বিপ্লবী বীর! অবাক অভ্যুদয়!
যদিও রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা কলকাতাময়।
তবু দেখ আজ রক্তে রক্তে সাড়া—
আমরা এসেছি উদ্দাম ভয়হারা।
আমরা এসেছি চারিদিক থেকে, ভুলতে কখনো পারি!
একসূত্রে যে বাঁধা হয়ে গেছে কবে কোন্ যুগে নাড়ী।
আমরা যে বারে বারে
তোমাদের কথা পৌঁছে দিয়েছি এদেশের দ্বারে দ্বারে,

মিছিলে মিছিলে সভায় সভায় উদাত্ত আহ্বানে,
তোমাদের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছি জনতার উত্থানে।
উদ্দাম ধ্বনি মুখরিত পথেঘাটে,
পার্কের মোড়ে, ঘরে, ময়দানে, মাঠে
মুক্তির দাবি করেছি তীব্রতর,
সারা কলকাতা শ্লোগানেই থরোথরো।
এই সেই কলকাতা!
একদিন যার ভয়ে দুরু দুরু বৃটিশ নোয়াত মাথা!
মনে পড়ে চব্বিশে?
সেদিন দুপুরে সারা কলকাতা হারিয়ে ফেলেছে দিশে;
হাজার হাজার জনসাধারণ ধেয়ে চলে সম্মুখে
পরিষদ-গেটে হাজির সকলে, শেষ প্রতিজ্ঞা বুকে
গর্জে উঠল হাজার হাজার ভাই:
রক্তের বিনিময় হয় হোক, আমরা ওদের চাই।
সফল! সফল! সেদিনের কলকাতা—
হেঁট হয়েছিল অত্যাচারী ও দাম্ভিকদের মাথা।
জানি বিকৃত আজকের কলকাতা
বৃটিশ এখন এখানে জনত্রাতা!

গৃহযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে—
ডেকেছে এখানে কালো রক্তের বান;
সেদিনের কলকাতা এ আঘাতে ভেঙে চুরে খান্‌খান্‌।
দিকে দিকে আজ বিদেশী প্রহরী, সঙ্গিন উদ্যত;
তোমরা এসেছ বীরের মতন, আমরা চোরের মতো।

তোমরা এসেছ, ভেঙেছ অন্ধকার—
তোমরা এসেছ, ভয় করি নাকো আর।

পায়ের স্পর্শে মেঘ কেটে যাবে, উজ্জ্বল রোদ্দুর
ছড়িয়ে পড়বে বহু দূর—বহুদূর।
তোমরা এসেছ, জেনো এইবার নির্ভয় কলকাতা—
অত্যাচারের হাত থেকে জানি তোমরা মুক্তিদাতা।
তোমরা এসেছ, শিহরণ ঘাসে ঘাসে :
পাখির কাকলি উদ্দাম উচ্ছ্বাসে,
মর্মরধ্বনি তরুপল্লবে শাখায় শাখায় লাগে ;
হঠাৎ মৌন মহাসমুদ্র জাগে
অস্থির হাওয়া অরণ্যপর্বতে,
গুঞ্জন ওঠে তোমরা যাও যে-পথে।

আজ তোমাদের মুক্তিসভায় তোমাদের সম্মুখে,
শপথ নিলাম আমরা হাজার মুখে :
যতদিন আছে আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্মান,
আমরা রুখব গৃহযুদ্ধের কালো রক্তের বান।
অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা, বুঝি আরো দিতে হবে
এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে।
তবুও আজকে ভরসা, যেহেতু তোমরা রয়েছ পাশে,
তোমরা রয়েছ এদেশের নিঃশ্বাসে!

তোমাদের পথ যদিও কুয়াশাময়,
উদ্দাম জয়যাত্রার পথে জেনো ও কিছুই নয়।
তোমরা রয়েছ, আমরা রয়েছি, দুর্জয় দুর্বার,
পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মুক্তির শেষ দ্বার।
আবার জ্বালাব বাতি,
হাজার সেলাম তাই নাও আজ, শেষযুদ্ধের সাথী॥

প্রিয়তমাসু

সীমান্তে আজ আমি প্রহরী।
অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে
আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি—
স্বদেশের সীমানায়।

ধূসর তিউনিসিয়া থেকে স্নিগ্ধ ইতালী,
স্নিগ্ধ ইতালী থেকে ছুটে গেছি বিপ্লবী ফ্রান্সে
নক্ষত্রনিয়ন্ত্রিত নিয়তির মতো
দুর্নিবার, অপরাহত রাইফেল হাতে :
—ফ্রান্স থেকে প্রতিবেশী বার্মাতেও।

আজ দেহে আমার সৈনিকের কড়া পোশাক,
হাতে এখনো দুর্জয় রাইফেল,
রক্তে রক্তে তরঙ্গিত জয়ের আর শক্তির দুর্বহ দম্ভ,
আজ এখন সীমান্তের প্রহরী আমি।

আজ কিন্তু নীল আকাশ আমাকে পাঠিয়েছে নিমন্ত্রণ,
স্বদেশের হাওয়া বয়ে এনেছে অনুরোধ,
চোখের সামনে খুলে ধরেছে সবুজ চিঠি :
কিছুতেই বুঝি না কী ক'রে এড়াব তাকে ?

কী ক'রে এড়াব এই সৈনিকের কড়া পোশাক ?
যুদ্ধ শেষ! মাঠে মাঠে প্রসারিত শান্তি,
চোখে এসে লাগছে তারই শীতল হাওয়া,
প্রতি মুহূর্তে শ্লথ হয়ে আসে হাতের রাইফেল,

গা থেকে খসে পড়তে চায় এই কড়া পোশাক,
রাত্রে চাঁদ ওঠে :   আমার চোখে ঘুম নেই।

তোমাকে ভেবেছি কতদিন,
কত শত্রুর পদক্ষেপ শোনার প্রতীক্ষার অবসরে,
কত গোলা ফাটার মুহূর্তে।
কতবার অবাধ্য হয়েছে মন, যুদ্ধজয়ের ফাঁকে ফাঁকে,
কতবার হৃদয় জ্বলেছে অনুশোচনার অঙ্গারে
তোমার আর তোমাদের ভাবনায়।
তোমাকে ফেলে এসেছি দারিদ্র্যের মধ্যে,
ছুঁড়ে দিয়েছি দুর্ভিক্ষের আগুনে,
ঝড়ে আর বন্যায়, মারী আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে
বার বার বিপন্ন হয়েছে তোমাদের অস্তিত্ব।
আর আমি ছুটে গেছি এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে।
জানি না আজো, আছ কি নেই,
দুর্ভিক্ষে ফাঁকা আর বন্যায় তলিয়ে গেছে কিনা ভিটে
জানি না তাও।

তবু লিখছি তোমাকে আজ : লিখছি আত্মম্ভর আশায়
ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে।
জানি, আমার জন্যে কেউ প্রতীক্ষা ক'রে নেই
মালায় আর পতাকায়, প্রদীপে আর মঙ্গলঘটে ;
জানি, সম্বর্ধনা রটবে না লোকমুখে,
মিলিত খুসিতে মিলবে না বীরত্বের পুরস্কার।
তবু, একটি হৃদয় নেচে উঠবে আমার আবির্ভাবে
সে তোমার হৃদয়।

যুদ্ধ চাই না আর, যুদ্ধ তো থেমে গেছে :
পদার্পণ করতে চায় না মন ইন্দোনেশিয়ায়।
আর সামনে নয়,
এবার পেছন ফেরার পালা।

পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক,
এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে।
প্রশ্ন করো যদি এত যুদ্ধ ক'রে পেলাম কী ? উত্তর তার-
তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়,
ইতালীতে জনগণের বন্ধুত্ব,
ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র ;
আর নিষ্কণ্টক বার্মায় পেলাম ঘরে ফেরার তাগাদা।

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার ॥

ছুরি

বিগত শেষ-সংশয় ; স্বপ্ন ক্রমে ছিন্ন,
আচ্ছাদন উন্মোচন করেছে যত ঘৃণ্য,
শঙ্কাকুল শিল্পীপ্রাণ, শঙ্কাকুল কৃষ্টি,
দুর্দিনের অন্ধকারে ক্রমশ খোলে দৃষ্টি।

হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত,
দেশকে যারা অস্ত্র হানে, তারা তো নয় ভ্রান্ত
বিদেশী-চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ্-বৃন্তে
সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে।
শিল্পীদের রক্তস্রোতে এসেছে চৈতন্য
গুপ্তঘাতী শত্রুদের করি না আজ গণ্য।
ভুলেছে যারা সভ্য-পথ, সম্মুখীন যুদ্ধ,
তাদের আজ মিলিত মুঠি করুক শ্বাসরুদ্ধ,
শহীদ্-খুন আগুন জ্বালে, শপথ অক্ষুণ্ণ :
এদেশ অতি শীঘ্র হবে বিদেশী-চর শূন্য।
বাঁচাব দেশ, আমার দেশ, হানবো প্রতিপক্ষ,
এ জনতার অন্ধ চোখে আনবো দৃঢ় লক্ষ্য।
বাইরে নয় ঘরেও আজ মৃত্যু ঢালে বৈরী,
এদেশে জন-বাহিনী তাই নিমেষে হয় তৈরী।

সূচনা

ভারতবর্ষে পাথরের গুরুভার :
এহেন অবস্থাকেই পাষাণ বলো,
প্রস্তরীভূত দেশের নীরবতার
একফোঁটা নেই অশ্রুও সম্বলও।

অহল্যা হল এই দেশ কোন্ পাপে
ক্ষুধার কান্না কঠিন পাথরে ঢাকা,

কোনো সাড়া নেই আগুনের উত্তাপে
এ নৈঃশব্দ্য ভেঙেছে কালের চাকা।

ভারতবর্ষ ! কার প্রতীক্ষা করো,
কান পেতে কার শুনছ পদধ্বনি ?
বিদ্রোহে হবে পাথরেরা থরোথরো,
কবে দেখা দেবে লক্ষ প্রাণের খনি ?

ভারতী, তোমার অহল্যারূপ চিনি
রামের প্রতীক্ষাতেই কাটাও কাল,
যদি তুমি পায়ে বাজাও ও-কিঙ্কিনী,
তবে জানি বেঁচে উঠবেই কঙ্কাল।

কত বসন্ত গিয়েছে অহল্যা গো—
জীবনে ব্যর্থ তুমি তবু বার বার,
দ্বারে বসন্ত, একবার শুধু জাগো
দুহাতে সরাও পাষাণের গুরুভার।

অহল্যা-দেশ, তোমার মুখের ভাষা
অনুচ্চারিত, তবু অধৈর্যে ভরা ;
পাষাণ ছদ্মবেশকে ছেঁড়ার আশা
ক্রমশ তোমার হৃদয় পাগল করা।

ভারতবর্ষ, তন্দ্রা ক্রমশ ক্ষয়
অহল্যা। আজ শাপমোচনের দিন ;
তুষার-জনতা বুঝি জাগ্রত হয়—
গা-ঝাড়া দেবার প্রস্তাব দ্বিধাহীন।

অহল্যা, আজ কাঁপে কী পাষাণকায়।
রোমাঞ্চ লাগে পাঁথরের প্রত্যঙ্গে ;
রামের পদস্পর্শ কি লাগে গায় ?
অহল্যা, জেনো আমরা তোমার সঙ্গে ॥

অবৈধ

নরম ঘুমের ঘোর ভাঙল ?
দেখ চেয়ে অরাজক রাজ্য ;
ধ্বংস সমুখে কাঁপে নিত্য
এখনো বিপদ অগ্রাহ্য ?

পৃথিবী, এ পুরাতন পৃথিবী
দেখ আজ অবশেষে নিঃস্ব,
স্বপ্ন-অলস যত ছায়ারা
একে একে সকলি অদৃশ্য।

রুক্ষ মরুর দুঃস্বপ্ন
হৃদয় আজকে শ্বাসরুদ্ধ,
একলা গহন পথে চলতে
জীবন সহসা বিক্ষুব্ধ।

জীবন ললিত নয় আজকে
ঘুচেছে সকল নিরাপত্তা,

বিফল স্রোতের পিছুটানকে
শরণ করেছে ভীরু সত্তা।

তবু আজ রক্তের নিদ্রা,
তবু ভীরু স্বপ্নের সখ্য :
সহসা চমক লাগে চিত্তে
দুর্জয় হল প্রতিপক্ষ।

নিরুপায় ছিঁড়ে গেল দ্বৈধ
নির্জনে মুখ তোলে অঙ্কুর,
বুঝে নিল উদ্যোগী আত্মা
জীবন আজকে ক্ষণভঙ্গুর।

দলিত হৃদয় দেখে স্বপ্ন
নতুন, নতুনতর বিশ্ব,
তাই আজ স্বপ্নের ছায়ারা
একে একে সকলি অদৃশ্য ॥

মণিপুর

এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি,
সহস্র বছর ধ'রে একে আমি জানি পরিপাটি,
জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।

যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় কানে,
যুগ যুগ আমরা যে বেঁচে থাকি পতনে উত্থানে।
যে চাষী কেটেছে ধান, এ মাটিতে নিয়েছে কবর,
এখনো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর।
অদৃশ্য তাদের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন এদেশের ধূলি,
মাটিতে তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন ক'রে ভুলি ?
আমার সম্মুখে ক্ষেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি,
ভালবাসি এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি।
এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস্, তৈমুর,
সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।
কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়,
উর্বর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হাড়।
তবুও অজেয় এই শতাব্দীগ্রথিত হিন্দুস্থান,
এরই মধ্যে আমাদের বিকশিত স্বপ্নের সন্ধান।
আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে,
আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।
এ ধুলোয় প্রতিরোধ, এ হাওয়ায় ঘূর্ণিত চাবুক,
এখানে নিশ্চিহ্ন হল কত শত গর্বোদ্ধত বুক।
এ মাটির জন্যে প্রাণ দিয়েছি তো কত যুগ ধ'রে,
রেখেছি মাটির মান কতবার কত যুদ্ধ ক'রে।
আজকে যখন এই দিক্‌প্রান্তে পঠে রক্ত-ঝড়,
কোমল মাটিতে রাখে শত্রু তার পায়ের স্বাক্ষর,
তখন চিৎকার ক'রে রক্ত ব'লে ওঠে 'ধিক্ ধিক্,
এখনো দিল না দেখা দেহে দেহে নির্ভয় সৈনিক।
দাসত্বের ছদ্মবেশ দীর্ণ ক'রে উন্মোচিত হোক
একবার বিশ্বরূপ—হে উদ্দাম, হে অধিনায়ক।'

এদিকে উৎকর্ণ দিন, মণিপুর, কাঁপে মণিপুর
চৈত্রের হাওয়ায় ক্লান্ত, উৎকণ্ঠায় অস্থির দুপুর—
কবে দেখা দেবে, কবে প্রতীক্ষিত সেই শুভক্ষণ
ছড়াবে ঐশ্বর্য পথে জনতার দুরন্ত যৌবন ?
দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে—
এখনো শত্রুকে ক্ষমা ?   শত্রু কি করেছে ক্ষমা
বিধ্বস্ত বাংলাকে ?

আজকের এ মুহূর্তে অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতা,
কেন তাই মনে মনে আমি প্রশ্ন করি সেই কথা।
তুমি কি ক্ষুধিত বন্ধু ?   তুমি কি ব্যাধিতে জরোজরো ?
তা হোক, তবুও তুমি আর এক মৃত্যুকে রোধ করো।
বসন্ত লাগুক আজ আন্দোলিত প্রাণের শাখায়,
আজকে আসুক বেগ এ নিশ্চল রথের চাকায়,
এ মাটি উত্তপ্ত হোক, এ দিগন্তে আসুক বৈশাখ,
ক্ষুধার আগুনে আজ শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।
শত্রুরা নিয়েছে আজ দ্বিতীয় মৃত্যুর ছদ্মবেশ,
তবু কেন নিরুত্তর প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা দেশ ?
এদেশে কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি,
এদেশে বিপ্লবী আছে জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী।
দাসত্বের ধুলো ঝেড়ে তারা আজ আহ্বান পাঠাক,
ঘোষণা করুক তারা এ মাটিতে আসন্ন বৈশাখ।
তাই এই অবরুদ্ধ স্বপ্নহীন নিবিড় বাতাসে
শব্দ হয়, মনে হয় রাত্রিশেষে ওরা যেন আসে।
ওরা আসে, কান পেতে আমি তার পদধ্বনি শুনি,
মৃত্যুকে নিহত ক'রে ওরা আসে উজ্জ্বল আরুণি ;

পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে আজ অসহ্য আবেগে,
ওদের পায়ের স্পর্শে মাটিতে সোনার ধান, রঙ লাগে মেঘে।
এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ ওদের পতাকা,
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী আজ ঢাকা,
আগন্তুক ইতিহাসে ওরা আজ প্রথম অধ্যায়,
ওরা আজ পলিমাটি অবিরাম রক্তের বন্যায় ;
ওদের দুচোখে আজ বিকশিত আমার কামনা,
অভিনন্দন গাছে, পথের দুপাশে অভ্যর্থনা।
ওদের পতাকা ওড়ে গ্রামে গ্রামে নগরে বন্দরে,
মুক্তির সংগ্রাম সেরে ওরা ফেরে স্বপ্নময় ঘরে ॥

দিক্‌প্রান্তে

ভাঙন নেপথ্য পৃথিবীতে :
অদৃশ্য কালের শত্রু প্রচ্ছন্ন জোয়ারে,
অনেক বিপন্ন জীব ক্ষয়িষ্ণু খোঁয়াড়ে
উন্মুখ নিঃশেষে কেড়ে নিতে,
দুর্গম বিষণ্ণ শেষ শীতে।

বীভৎস প্রাণের কোষে কোষে
নিঃশব্দে ধ্বংসের বীজ নির্দিষ্ট আয়ুতে
পশেছে আঁধার রাত্রে—প্রত্যেক স্নায়ুতে ;-
গোপনে নক্ষত্র গেছে খসে
আরক্তিম আদিম প্রদোষে।

দিনের নীলাভ শেষ আলো
জানাল আসন্ন রাত্রি দুর্লক্ষ্য সংকেতে
অনেক কাস্তের শব্দ নিঃস্ব ধানক্ষেতে
সেই রাত্রে হাওয়ায় মিলাল :

দিক্‌প্রান্তে সূর্য চমকাল ॥

চিরদিনের

এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে,
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই, তবু এখানে যে পথ হাঁটা।

জোড়া দীঘি, তার পাড়েতে তালের সারি
দূরে বাঁশঝাড়ে আত্মদানের সাড়া,
পচা জল আর মশায় অহংকারী
নীরব এখানে অমর কিষাণপাড়া।

এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস
এ গ্রাম নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।

রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে
. কিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত।

দুর্ভিক্ষের আঁচল জড়ানো গায়ে
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।

রাত্রি হলেই দাওয়ার অন্ধকারে।
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে,
কেমন ক'রে সে আকালেতে গতবারে
চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে।

এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে
কামার, কুমোর, তাঁতী তার কাজে জোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষীর কানে
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে॥

নিভৃত

অনিশ্চিত পৃথিবীতে অরণ্যের ফুল
রচে গেল ভুল ;
তারা তো জানত যারা পরম ঈশ্বর
তাদের বিভিন্ন নয় স্তর,
অনন্তর
তারাই তাদের সৃষ্টিতে
অনর্থক পৃথক দৃষ্টিতে
একই কারুকার্যে নিয়মিত
উত্তপ্ত গলিত
ধাতুদের পরিচয় দিত।
শেষ অধ্যায় এল অকস্মাৎ।
তখন প্রমত্ত প্রতিঘাত
শ্রেয় মেনে নিল ইতিহাস,
অকল্পেয় পরিহাস
সুদূর দিগন্তকোণে সকরুণ বিলাল নিঃশ্বাস

যেখানে হিমের রাজ্য ছিল,
যেখানে প্রচ্ছন্ন ছিল পশুর মিছিলও
সেখানেও ধানের মঞ্জরী
প্রাণের উত্তাপে ফোটে, বিচ্ছিন্ন শর্বরী
সূর্য-সহচরী !
তাই নিত্যবুভুক্ষিত মন
চিরন্তন
লোভের নিষ্ঠুর হাত বাড়াল চৌদিকে

পৃথিবীকে
.একাগ্রতায় নিলো লিখে।
সহসা প্রকম্পিত সুষুপ্ত সত্তায়
কঠিন আঘাত লাগে সুনিরাপত্তায়।
ব্যর্থ হল গুপ্ত পরিপাক,
বিফল চিৎকার তোলে বুভুক্ষার কাক ;
—পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক ॥

বৈশম্পায়ন

আকাশের খাপছাড়া ক্রন্দন
নাই আর আষাঢ়ের খেলনা।
নিত্য যে পাণ্ডুর জড়তা
সাথীহারা পথিকের সঞ্চয়।

রিক্তের বুকভরা নিঃশ্বাস,
আঁধারের বুকফাটা চীৎকার—
এই নিয়ে মেতে আছি আমরা
কাজ নেই হিসাবের খাতাতে।

মিলাল দিনের কোনো ছায়াতে
পিপাসায় আর কূল পাই না ;
হারানো স্মৃতির মৃদু গন্ধে
প্রাণ কভু হয় নাকো চঞ্চল।

মাঝে মাঝে অনাহূত আহ্বান
আনে কই আলেয়ার বিত্ত ?
শহরের জমকালো খবরে
হাজিরা খাতাটা থাকে শূন্য ।

আনমনে জানা পথ চলতে
পাই নাকো মাদকের গন্ধ !
রাত্রিদিনের দাবা চালেতে
আমাদের মন কেন উষ্ণ ?

শ্মশানঘাটেতে ব'সে কখনো
দেখি নাই মরীচিকা সহসা,
তাই বুঝি চিরকাল আঁধারে
আমরাই দেখি শুধু স্বপ্ন !

বার বার কায়াহীন ছায়ারে
ধরেছিনু বাহুপাশে জড়িয়ে,
তাই আজ গৈরিক মাটিতে
রঙিন বসন করি শুদ্ধ ॥

নিভৃত

বিষণ্ণ রাত, প্রসন্ন দিন আনো
আজ মরণের অন্ধ অনিদ্রায়,
সে অন্ধতায় সূর্যের আলো হানো,
শ্বেত স্বপ্নের ঘোরে যে মৃতপ্রায়।

নিভৃত-জীবন-পরিচর্যায় কাটে
যে দিনের, আজ সেখানে প্রবল দ্বন্দ্ব।
নিরন্ন প্রেম ফেরে নির্জন হাটে,
অচল চরণ ললাটের নির্বন্ধ ?

জীবন মরণে প্রাণের গভীরে দোলা
কাল রাতে ছিল নিশীথ কুসুমগন্ধী,
আজ সূর্যের আলোয় পথকে ভোলা
মনে হয় ভীরু মনের দুরভিসন্ধি ॥

কবে

অনেক স্তব্ধ দিনের এপারে চকিত চতুর্দিক,
আজো বেঁচে আছি, মৃত্যুতাড়িত আজো বেঁচে আছি ঠিক।
দুলে ওঠে দিন : শপথমুখর কিষাণ-শ্রমিকপাড়া,
হাজারে হাজারে মাঠে বন্দরে আজকে দিয়েছে সাড়া।

জ্বলে আলো আজ, আমাদের হাড়ে জমা হয় বিদ্যুৎ,
নিহত দিনের দীর্ঘ শাখায় ফোটে বসন্তদূত।
মূঢ় ইতিহাস ; চল্লিশ কোটি সৈন্যের সেনাপতি।
সংহত দিন, রুখবে কে এই একত্রীভূত গতি ?
জানি আমাদের অনেক যুগের সঞ্চিত স্বপ্নেরা
দ্রুত মুকুলিত তোমার দিন ও রাত্রি দিয়েই ঘেরা।
তাই হে আদিম, ক্ষতবিক্ষত জীবনের বিস্ময়,
ছড়াও প্লাবন, দুঃসহ দিন আর বিলম্ব নয়।
সারা পৃথিবীর দুয়ারে মুক্তি, এখানে অন্ধকার,
এখানে কখন আসন্ন হবে বৈতরণীর পার ?

অলক্ষ্যে

আমার মৃত্যুর পর কেটে গেল বৎসর বৎসর ;
ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির ব্যর্থ প্রচেষ্টাও আজ অগভীর,
এখন পৃথিবী নয় অতিক্রান্ত প্রায়ান্ধ স্থবির :
নিভেছে প্রধূম্রজ্বালা, নিরঙ্কুশ সূর্য অনশ্বর ;
স্তব্ধতা নেমেছে রাত্রে থেমেছে নির্ভীক তীক্ষ্ণস্বর-
অথবা নিরন্ন দিন, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা ;
উদ্ধত বজ্রের ভয়ে নিঃশব্দে মৃত্যুর আনাগোনা,
অনন্য মানবসত্তা ক্রমান্বয়ে স্বল্পপরিসর।

গলিত স্মৃতির বাষ্প সেদিনের পল্লব শাখায়
বারম্বার প্রতারিত অস্ফুট কুয়াশা রচনায় ;

বিলুপ্ত বক্সের ঢেউ নিশ্চিত মৃত্যুতে প্রতিহত।
আমার অজ্ঞাত দিন নগণ্য উদার উপেক্ষাতে
অগ্রগামী শূন্যতাকে লাঞ্ছিত করেছে অবিরত
তথাপি তা প্রস্ফুটিত মৃত্যুর অদৃশ্য দুই হাতে॥

মহাত্মাজীর প্রতি

চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে ; তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী।
এখানে আমরা লড়েছি, মরেছি, করেছি অঙ্গীকার,
এ মৃতদেহের বাধা ঠেলে হব অজেয় রাজ্যে পার।
এসেছে বন্যা, এসেছে মৃত্যু, পরে যুদ্ধের ঝড়,
মন্বন্তর রেখে গেছে তার পথে পথে স্বাক্ষর,
প্রতি মুহূর্তে বুঝেছি এবার মুছে নেবে ইতিহাস—
তবু উদ্দাম, মৃত্যুআহত ফেলি নি দীর্ঘশ্বাস ;
নগর গ্রামের শ্মশানে শ্মশানে নিহত অভিজ্ঞান :
বহু মৃত্যুর মুখোমুখি দৃঢ় করেছি জয়ের ধ্যান।
তাইতো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।

দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠাল্লে ডাক,
তাইতো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ ॥

পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে

আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবার তুমি জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।
হতাশায় স্তব্ধ বাক্য ; ভাষা চাই আমরা নির্বাক,
পাঠাব মৈত্রীর বাণী সারা পৃথিবীকে জানি ফের।
রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমাদের ভাষা যাবে শোনা
ভেঙে যাবে রুদ্ধশ্বাস নিরুদ্যম সুদীর্ঘ মৌনতা
আমাদেরই দুঃখসুখে ব্যক্ত হবে প্রত্যেক রচনা
পীড়নের প্রতিবাদে উচ্চারিত হবে সব কথা।

আমি দিব্যচক্ষে দেখি অনাগত সে রবীন্দ্রনাথ :
দস্যুতায় দৃপ্তকণ্ঠ (বিগত দিনের)
ধৈর্যের বাঁধন যার ভাঙে দুঃশাসনের আঘাত,
যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক, যে যন্ত্রণা সহায়হীনের।
বিগত দুর্ভিক্ষে যার উত্তেজিত তিক্ত তীব্র ভাষা
মৃত্যুতে ব্যথিত আর লোভের বিরুদ্ধে খরধার,
ধ্বংসের প্রান্তরে বসে আনে দৃঢ় অনাহত আশা ;
তাঁর জন্ম অনিবার্য, তাঁকে ফিরে পাবই আবার।

রবীন্দ্রনাথের সেই ভুলে যাওয়া বাণী
অকস্মাৎ করে কানাকানি
'দামামা ঐ বাজে, দিন বদলের পালা
এল ঝড়ো যুগের মাঝে'।

নিষ্কম্প গাছের পাতা, রুদ্ধশ্বাস অগ্নিগর্ভ দি ন,
বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে এ আকাশ, গতিরুদ্ধ বায়ু ;
আবিশ্ব জিজ্ঞাসা এক চোখে মুখে ছড়ায় রঙিন
সংশয় স্পন্দিত স্বপ্ন, ভীত আশা উচ্চারণহীন
মেলে না উত্তর কোনো, সমস্যায় উত্তেজিত স্নায়ু।
ইতিহাস মোড় ফেরে পদতলে বিধ্বস্ত বার্লিন,
পশ্চিম সীমান্তে শান্তি, দীর্ঘ হয় পৃথিবীর আয়ু,
দিকে দিকে জয়ধ্বনি, কাঁপে দিন রক্তাক্ত আভায়।
রামরাবণের যুদ্ধে বিক্ষত এ ভারতজটায়ু
মৃতপ্রায়, যুদ্ধাহত, পীড়নে-দুর্ভিক্ষে মৌনমূক।
পূর্বাচল দীপ্ত ক'রে বিশ্বজন-সমৃদ্ধ সভায়
রবীন্দ্রনাথের বাণী তার দাবি ঘোষণা করুক।
এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর ;
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।

যদিও সে অনাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক
আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ॥

পরিশিষ্ট

অনেক উল্কার স্রোত বয়েছিল হঠাৎ প্রত্যুষে,
বিনিদ্র তারার বক্ষে পল্লবিত মেঘ
ছুঁয়েছিল রশ্মিটুকু প্রথম আবেগে।
অকস্মাৎ কম্পমান অশরীরী দিন,
রক্তের বাসরঘরে বিবর্ণ মৃত্যুর বীজ
ছড়াল আসন্ন রাজপথে।
তবু স্বপ্ন নয় :
গোধূলির প্রত্যহ ছায়ায়
গোপন স্বাক্ষর সৃষ্টি কক্ষচ্যুত গ্রহ-উপবনে ;
দিগন্তের নিশ্চল আভাস
ভস্মীভূত শ্মশানক্রন্দনে,
রক্তিম আকাশচিহ্ন সবেগে প্রস্থান করে
যূথ ব্যঞ্জনায়।

নিষিদ্ধ কল্পনাগুলি বন্ধ্যা তবু
অলক্ষ্যে প্রসব করে অব্যক্ত যন্ত্রণা,
প্রথম যৌবন তার রক্তময় রিক্ত জয়টীকা
স্তম্ভিত জীবন হতে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিল।
তারপর :
প্রান্তিক যাত্রায়
অতৃপ্ত রাত্রির স্বাদ,
বাসর শয্যায়
অসম্বৃত দীর্ঘশ্বাস
বিস্মরণী সুরাপানে নিত্য নিমজ্জিত

স্বগত জাহ্নবীজলে।
তৃষ্ণার্ত কঙ্কাল
অতীত অমৃত পানে দৃষ্টি হানে কত!
সর্বগ্রাসী প্রলুব্ধ চিতার অপবাদে
সভয়ে সন্ধান করে ইতিবৃত্ত দগ্ধপ্রায় মনে।
প্রেতাত্মার প্রতিবিম্ব বার্ধক্যের প্রকম্পনে লীন,
অনুর্বর জীবনের সূর্যোদয় :
ভস্মশেষ চিতা।
কুজ্মটিকা মূর্ছা গেল আলোক-সম্পাতে
বাসনা-উদ্‌গ্রীব চিন্তা
উন্মুখ ধ্বংসের আর্তনাদে।

সরীসৃপ বন্যা যেন জড়তার স্থির প্রতিবাদ,
মানবিক অভিযানে নিশ্চিন্ত উষ্ণীষ!
প্রচ্ছন্ন অগ্ন্যুৎপাতে সংজ্ঞাহীন মেরুদণ্ড-দিন
নিতান্ত ভঙ্গুর, তাই উদ্যত সৃষ্টির ত্রাসে কাঁপে :
পণ্যভারে জর্জরিত পাথেয় সংগ্রাম,
চকিত হরিণদৃষ্টি অভুক্ত মনের পুষ্টিকর :
অনাসক্ত চৈতন্যের অস্থায়ী প্রয়াণ।
অথবা দৈবাৎ কোন নৈর্ব্যক্তিক আশার নিঃশ্বাস
নগণ্য অঙ্গারতলে খুঁজেছে অন্তিম।
রুদ্ধশ্বাস বসন্তের আদিম প্রকাশ,
বিপ্রলব্ধ জনতার কুটিল বিষাক্ত পরিবাদে
প্রত্যহ লাঞ্ছিত স্বপ্ন,
স্পর্ধিত আঘাত।
সুষুপ্ত প্রকোষ্ঠতলে তন্দ্রাহীন দ্বৈতাচারী নর

নিজেরে বিনষ্ট করে উৎসারিত ধূমে,
অদ্ভুত ব্যাধির হিমছায়া
দীর্ণ করে নির্যাতিত শুদ্ধ কল্পনাকে ;
সদ্যমৃত-পৃথিবীর মানুষের মতো
প্রত্যেক মানবমনে একই উত্তাপ অবসাদে।
তবুও শার্দূল-মন অন্ধকারে সন্ধ্যার মিছিলে
প্রথম বিস্ময়দৃষ্টি মেলে ধরে বিষাক্ত বিশ্বাসে।

বহ্নিমান তপ্তশিখা উন্মেষিত প্রথম স্পর্ধায়—
বিষকন্যা পৃথিবীর চক্রান্তে বিহ্বল
উপস্থিত প্রহরী সভ্যতা।
ধূসর অগ্নির পিণ্ড : উত্তাপবিহীন
স্তিমিত মত্ততাগুলি স্তব্ধ নীহারিকা,
মৃত্তিকার ধাত্রী অবশেষে॥

মীমাংসা

আজকে হঠাৎ সাত-সমুদ্র তের-নদী
পার হতে সাধ জাগে মনে, হায় তবু যদি
পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষীরাজ
প্রস্রবণের মতো এসে যেত হঠাৎ আজ—
তাহলে না হয় আকাশ বিহার হত সফল,
টুকরো মেঘেরা যেতে যেতে ছুঁয়ে যেত কপোল।

আর আমি বুঝি দৈত্যদলনে সাগর পার
হ'তাম ; যেখানে দানবের দায়ে সব আঁধার।
মত্ত যেখানে দৈত্যে দৈত্যে বিবাদ ভারি :
হানাহানি নিয়ে সুন্দরী এক রাজকুমারী।
(রাজকন্যার লোভ নেই,—লোভ অলঙ্কারে,
দৈত্যেরা শুধু বিবস্ত্রা ক'রে চায় তাহারে।)

আমি একজন লুপ্তগর্ব রাজার তনয়
এত অন্যায় সহ্য করব কোনোমতে নয়—
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝল্‌সে উঠবে আমার অসির কিরণ।

ভাঙাচোরা এক তলোয়ার আছে, (নয় দু'ধারী)
তাও হ'ত তবে পক্ষীরাজেরই অভাব ভারি।
তাই ভাবি আজ, তবে আমি খুঁজে নেব কৌপীন
নেব কয়েকটা বেছে জানা জানা বুলি সৌখিন॥

অবৈধ

আজ মনে হয় বসন্ত আমার জীবনে এসেছিল
উত্তর মহাসাগরের কূলে
আমার স্বপ্নের ফুলে
তারা কথা কয়েছিল
অস্পষ্ট পুরনো ভাষায়।

অস্ফুট স্বপ্নের ফুল
অসহ্য সূর্যের তাপে
অনিবার্য ঝরেছিল
মরেছিল নিষ্ঠুর প্রগল্‌ভ হতাশায়।

হঠাৎ চমকে ওঠে হাওয়া
সেদিন আর নেই—
নেই আর সূর্য-বিকিরণ
আমার জীবনে তাই ব্যর্থ হল বাসন্তীমরণ!

শুনি নি স্বপ্নের ডাক :
থেকেছি আশ্চর্য নির্বাক
বিন্যস্ত করেছি প্রাণ বুভুক্ষার হাতে।
সহসা একদিন
আমার দরজায় নেমে এল
নিঃশব্দে উড়ন্ত গৃধিনীরা।
সেইদিন বসন্তের পাখি
উড়ে গেল
যেখানে দিগন্ত ঘনায়িত।

আজ মনে হয়
হেমন্তের পড়ন্ত রোদ্দুরে,
কী ক'রে সম্ভব হল
আমার রক্তকে ভালবাসা
সূর্যের কুয়াশা
এখনো কাটে নি

ঘোচে নি অকাল দুর্ভাবনা।
মুহূর্তের সোনা
এখ্নো সভয়ে ক্ষয় হয়,
এরই মধ্যে হেমন্তের পড়ন্ত রোদ্দুর
কঠিন কাস্তেতে দেয় সুর,
অন্যমনে এ কী দুর্ঘটনা—
হেমন্তেই বসন্তের প্রস্তাব রটনা॥

১৯৪১ সাল

নীল সমুদ্রের ইশারা—
অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর ছোট ছোট দ্বীপ,
আর সূর্যময় দিনের স্তব্ধতা ;
নিঃশব্দ দিনের সেই ভীরু অন্তঃশীল
মত্ততাময় পদক্ষেপ :
এ সবের ম্লান আধিপত্য বুঝি আর
জীবনের ওপর কালের ব্যবচ্ছেদ-ভ্রষ্ট নয়।
তাই রক্তাক্ত পৃথিবীর ডাকঘর থেকে
ডাক এল—
সভ্যতার ডাক্।
নিষ্ঠুর ক্ষুধার্ত পরোয়ানা
আমাকে চিহ্নিত ক'রে গেল।
আমার একক পৃথিবী
ভেসে গেল জনতার প্রবল জোয়ারে।

মনের স্বচ্ছতার ওপর বিরক্তির শ্যাওলা
গভীরতা রচনা করে,
আর শঙ্কিত মনের অস্পষ্টতা
ইতস্ততঃ ধাবমান।
নির্ধারিত জীবনের মাটির মাশুল
পূর্ণতায় মূর্তি চায় ;
আমার নিষ্ফল প্রতিবাদ,
আরো অনেকের বিরুদ্ধ বিবক্ষা
তাই পরাহত হল।
কোথায় সেই দূর সমুদ্রের ইশারা
আর অন্ধকারের নির্বিরোধ ডাক !
দিনের মুখে মৃত্যুর মুখোস।
যে সব মুহূর্ত-পরমাণু
গেঁথেছিল অস্থায়ী রচনা,
সে সব মুহূর্তে আজ
প্রাণের অস্পষ্ট প্রশাখায়
অজ্ঞাত রক্তিম ফুল ফোটে ॥

রোম : ১৯৪৩

ভেঙেছে সাম্রাজ্যস্বপ্ন, ছত্রপতি হয়েছে উধাও ;
শৃঙ্খল গড়ার দুর্গ ভূমিসাৎ বহু শতাব্দীর।
'সাথী, আজ দৃঢ় হাতে হাতিয়ার নাও'—
রোমের প্রত্যেক পথে ওঠে ডাক ক্রমশ অস্থির।

উদ্ধত ক্ষমতালোভী দস্যুতার ব্যর্থ পরাক্রম,
মুক্তির উত্তপ্ত স্পর্শে প্রকম্পিত যুগ যুগ অন্ধকার রোম।

হাজার বছর ধ'রে দাসত্ব বেঁধেছে বাসা রোমের দেউলে,
দিয়েছে অনেক রক্ত রোমের শ্রমিক—
তাদের শক্তির হাওয়া মুক্তির দুয়ার দিল খুলে,
আজকে রক্তাক্ত পথ ; উদ্ভাসিত দিক।
শিল্পী আর মজুরের বহু পরিশ্রম
একদিন গড়েছিল রোম,
তারা আজ একে একে ভেঙে দেয় রোমের সে সৌন্দর্যসম্ভার,
ভগ্নস্তূপে ভবিষ্যৎ মুক্তির প্রচার।

রোমের বিপ্লবী হৃৎস্পন্দনে ধ্বনিত
মুক্তির সশস্ত্র ফৌজ আসে অগণিত
দুচোখে সংহার-স্বপ্ন, বুকে তীব্র ঘৃণা
শত্রুকে বিধ্বস্ত করা যেতে পারে কিনা
রাইফেলের মুখে এই সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা।
যদিও উদ্বেগ মনে, তবু দীপ্ত আশা—
পথে পথে জনতার রক্তাক্ত উত্থান,
বিস্ফোরণে বিস্ফোরণে ডেকে ওঠে বান।

ভেঙে পড়ে দস্যুতার, পশুতার প্রথম প্রাসাদ
বিক্ষুব্ধ অগ্ন্যুৎপাতে উচ্চারিত শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ।
যে উদ্ধত একদিন দেশে দেশে দিয়েছে শৃঙ্খল
আবিসিনিয়ার চোখে আজ তার সে দম্ভ নিষ্ফল।

এদিকে ত্বরিত সূর্য রোমের আকাশে
যদিও কুয়াশাঢাকা আকাশের নীল,
তবুও বিপ্লবী জানে, সোভিয়েট পাশে

জনরব

পাখি সব করে রব, রাত্রি শেষ ঘোষণা চৌদিকে,
ভোরের কাকলি শুনি ; অন্ধকার হয়ে আসে ফিকে,
আমার ঘরেও রুদ্ধ অন্ধকার, স্পষ্ট নয় আলো,
পাখিরা ভোরের বার্তা অকস্মাৎ আমাকে শোনালো।
স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠি, অন্ধকারে খাড়া করি কান —
পাখিদের মাতামাতি, শুনি মুখরিত ঐকতান
আজ এই রাত্রিশেষে বাইরে পাখির কলরবে
রুদ্ধ ঘরে ব'সে ভাবি, হয়তো কিছু বা শুরু হবে,
হয়তো এখনি কোনো মুক্তিদূত দুরন্ত রাখাল
মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল ;
স্বপ্নের কুসুমকলি হয়তো বা ফুটেছে কাননে.
আমি কি খবর রাখি ? আমি বদ্ধ থাকি গৃহকোণে,
নির্বাসিত মন নিয়ে চিরকাল অন্ধকারে বাসা,
তাইতো মুক্তির স্বপ্ন আমাদের নিতান্ত দুরাশা।
জন-পাখিদের কণ্ঠে তবুও আলোর অভ্যর্থনা,
দিকে দিকে প্রতিদিন অবিশ্রান্ত শুধু যায় শোনা ;
এরা তো নগন্য জানি, তুচ্ছ ব'লে ক'রে থাকি ঘৃণা,
আলোর খবর এরা কি ক'রে যে পায় তা জানি না।

এদের মিলিত সুরে কেন যেন বুক ওঠে দুলে,
অকস্মাৎ পূর্বদিকে মনের জানালা দিই খুলে :
হঠাৎ বন্দর ছাড়া বাঁশি বুঝি বাজায় জাহাজ,
চকিতে আমার মনে বিদ্যুৎ বিদীর্ণ হয় আজ।
অদূরে হঠাৎ বাজে কারখানার পাঞ্চজন্যধ্বনি,
দেখি দলে দলে লোক ঘুম ভেঙে ছুটেছে তখনি :
মনে হয়, যদি বাজে মুক্তি-কারখানার তীব্র শাঁখ
তবে কি হবে না জমা সেখানে জনতা লাখে লাখ?
জন-পাখিদের গানে মুখরিত হবে কি আকাশ?
- ভাবে নির্বাসিত মন, চিরকাল অন্ধকারে বাস।

পাখিদের মাতামাতি : বুঝি মুক্তি নয় অসম্ভব,
যদিও ওঠে নি সূর্য, তবু আজ শুনি জনরব॥

রৌদ্রের গান

এখানে সূর্য ছড়ায় অকৃপণ
দুহাতে তীব্র সোনার মতন মদ,
যে সোনার মদ পান ক'রে ধান ক্ষেত
দিকে দিকে তার গড়ে তোলে জনপদ।

ভাবতী! তোমার লাবণ্য দেহ ঢাকে
রৌদ্র তোমায় পরায় সোনার হার,

সূর্য তোমার শুকায় সবুজ চুল
প্রেয়সী, তোমার কত না অহংকার।

সারাটা বছর সূর্য এখানে বাঁধা
রোদে ঝলসায় মৌন পাহাড় কোনো,
অবাধ রৌদ্রে তীব্র দহন ভরা
রৌদ্রে জ্বলুক তোমার আমার মনও।

বিদেশকে আজ ডাকো রৌদ্রের ভোজে
মুঠো মুঠো দাও কোষাগার-ভরা সোনা,
প্রান্তর বন ঝলমল করে রোদে
কী মধুর আহা রৌদ্রে প্রহর গোনা।

রৌদ্রে কঠিন ইস্পাত উজ্জ্বল
ঝকমক করে ইশারা যে তার বুকে,
শূন্য নীরব মাঠে রৌদ্রের প্রজা
স্তব করে জানি সূর্যের সম্মুখে।

পথিক-বিরল রাজপথে সূর্যের
প্রতিনিধি হাঁকে আসন্ন কলরব,
মাধ্যাহ্নের কঠোর ধ্যানের শেষে
জানি আছে এক নির্ভয় উৎসব।

তাইতো এখানে সূর্য তাড়ায় রাত
প্রেয়সী, তুমি কি মেঘভয়ে আজ ভীত ?
কৌতুকছলে এ মেঘ দেখায় ভয়,
এ ক্ষণিক মেঘ কেটে যাবে নিশ্চিত।

সূর্য, তোমায় আজকে এখানে ডাকি—
দুর্বল মন, দুর্বলতর কায়া,
আমি যে পুরনো অচল দীঘির জল
আমার এ বুকে জাগাও প্রতিচ্ছায়া ॥

দেওয়ালী

তোর সেই ইংরাজীতে দেওয়ালীর শুভেচ্ছা কামনা
পেয়েছি, তবুও আমি নিরুৎসাহে আজ অন্যমনা,
আমার নেইকো সুখ, দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব,
রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব।
এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি,
মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালী,
সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা :
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা,
তবু তোর রঙচঙে সুমধুর চিঠির জবাবে
কিছু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে
পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেসে যাবে রক্তের প্লাবনে।
যদিও সর্বদা তোর শুভ আমি চাই মনে মনে,
তবুও নতুন ক'রে আজ চাই তোর শান্তিসুখ,
মনের আঁধারে তোর শত শত প্রদীপ জ্বলুক,
এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে ?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে,
আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রঙ, নেই রোশনাই —
শুধু মাত্র ছন্দ আছে, তাই দিয়ে শুভেচ্ছা পাঠাই ॥

পূর্বাভাস

পূর্বাভাস

সন্ধ্যার আকাশতলে পীড়িত নিঃশ্বাসে
বিশীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ ম্লান হয়ে আসে।
বুভুক্ষু প্রেতেরা হাসে শাণিত বিদ্রূপে,
প্রাণ চাই শতাব্দীর বিলুপ্ত রক্তের
সুষুপ্ত যক্ষেরা নিত্য কাঁদিছে ক্ষুধায়
ধূর্ত দাবাগ্নি আজ জ্বলে চুপে চুপে,
প্রমত্ত কস্তুরীমৃগ ক্ষুব্ধ চেতনায়
বিপন্ন করুণ ডাকে তোলে আর্তনাদ।
ব্যর্থ আজ শব্দভেদী বাণ—
সহস্র তির্যক্‌শৃঙ্গ করিছে বিবাদ
জীবন-মৃত্যুর সীমানায়।
লাঞ্ছিত সম্মান
ফিরে চায় ভীরু-দৃষ্টি দিয়ে।
দুর্বল তিতিক্ষা আজ দুর্বাশার তেজে
স্বপ্ন মাঝে উঠেছে বিষিয়ে।

দূর পূর্বাকাশে,
বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়।
মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ
বিস্ফারিত হিংস্র-বেদনায়।
অসংখ্য স্পন্দনে চলে মৃত্যু অভিযান
লৌহের দুয়ারে পড়ে কুটিল আঘাত,
উত্তপ্ত মাটিতে ঝরে বর্ণহীন শোণিত প্রপাত

সুপ্তোত্থিত পিরামিড দুঃসহ জ্বালায়
পৈশাচিক ক্রূর হাসি হেসে
বিস্তীর্ণ অরণ্য মাঝে কুঠার চালায়।
কালো মৃত্যু ফিরে যায় এসে ॥

হে পৃথিবী

হে পৃথিবী, আজিকে বিদায়
এ দুর্ভাগা চায়,
যদি কভু শুধু ভুল ক'রে
মনে রাখো মোরে,
বিলুপ্তি সার্থক মনে হবে
দুর্ভাগার।
বিস্মৃত শৈশবে
যে আঁধার ছিল চারিভিতে
তারে কি নিভৃতে
আবার আপন ক'রে পাব,
ব্যর্থতার চিহ্ন এঁকে যাব,
স্মৃতির মর্মরে ?
প্রভাতপাখির কলস্বরে
যে লগ্নে করেছি অভিযান,
আজ তার তিক্ত অবসান

তবু তো পথের পাশে পাশে
প্রতি ঘাসে ঘাসে
লেগেছে বিস্ময় !
সেই মোর জয় ॥

সহসা

আমার গোপন সূর্য হল অস্তগামী
এপারে মর্মরধ্বনি শুনি,
নিস্পন্দ শবের রাজ্য হতে
ক্লান্ত চোখে তাকাল শকুনি।

গোধূলি আকাশ ব'লে দিল
তোমার মরণ অতি কাছে,
তোমার বিশাল পৃথিবীতে
এখনো বসন্ত বেঁচে আছে।

অদূরে নিবিড় ঝাউবনে
যে কালো ঘিরেছে নীরবতা,
চোখ তারই দীর্ঘায়িত পথে
অস্পষ্ট ভাষায় কয় কথা।

আমার দিনান্ত নামে ধীরে
আমি তো সুদূর পরাহত,

অশত্থশাখায় কালো পাখি
দুশ্চিন্তা ছড়ায় অবিরত।

সন্ধ্যাবেলা, আজ সন্ধ্যাবেলা
নিষ্ঠুর তমিস্রা ঘনাল কী!
মরণ পশ্চাতে বুঝি ছিল
সহসা উদার চোখাচোখি ॥

স্মারক

আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
তবুও পড়িবে মনে,
চঞ্চল হাওয়া যদি ফেরে কভু হৃদয়ের আঙিনায়
রজনীগন্ধা বনে,
তবুও পড়িবে মনে।
বলাকার পাখা আজও যদি উড়ে সুদূর দিগঞ্চলে
বন্যার মহাবেগে,
তবুও আমার স্তব্ধ বুকের ক্রন্দন যাবে মেলে
মুক্তির ঢেউ লেগে,
বন্যার মহাবেগে।
বাসরঘরের প্রভাতের মতো স্বপ্ন মিলায় যদি
বিনিদ্র কলরবে
তবুও পথের শেষ সীমাটুকু চিরকাল নিরবধি

পার হয়ে যেতে হবে,
বিনিদ্র কলরবে।
মদিরাপাত্র শুষ্ক যখন উৎসবহীন রাতে
বিষণ্ণ অবসাদে।
বুঝি বা তখন সুপ্তির তৃষা ক্ষুব্ধ নয়নপাতে
অস্থির হয়ে কাঁদে,
বিষণ্ণ অবসাদে।
নির্জন পথে হঠাৎ হাওয়ার আসক্তিহীন মায়া
ধূলিরে উড়ায় দূরে,
আমার বিবাগী মনের কোনেতে কিসের গোপন ছায়া
নিঃশ্বাস ফেলে সুরে ;
ধূলিরে উড়ায় দূরে।
কাহার চকিত-চাহনি-অধীর পিছনের পানে চেয়ে
কাঁদিয়া কাটায় রাতি,
আলেয়ার বুকে জ্যোৎস্নার ছবি সহসা দেখিতে পেয়ে
জ্বলে নাই তার বাতি,
কাঁদিয়া কাটায় রাতি।
বিরহিণী তারা আঁধারের বুকে সূর্যেরে কভু হায়
দেখেনিকো কোনো ক্ষণে।
আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
হয়তো পড়িবে মনে,
রজনীগন্ধা বনে॥

নিবৃত্তির পূর্বে

দুর্বল পৃথিবী কাঁদে জটিল বিকারে,
মৃত্যুহীন ধমনীর জ্বলন্ত প্রলাপ ;
অবরুদ্ধ বক্ষে তার উন্মাদ তড়িৎ :
নিত্য দেখে বিভীষিকা পূর্ব অভিশাপ।

ভয়ার্ত শোণিত-চক্ষে নামে কালোছায়া,
রক্তাক্ত ঝটিকা আনে মূর্ত শিহরণ—
দিক্‌প্রান্তে শোকাতুরা হাসে ক্রূর হাসি :
রোগগ্রস্ত সন্তানের অদ্ভুত মরণ।

দৃষ্টিহীন আকাশের নিষ্ঠুর সান্ত্বনা :
ধূ-ধূ করে চেরাপুঞ্জি—সহিষ্ণু হৃদয়।
ক্লান্তিহারা পথিকের অরণ্য ক্রন্দন ;
নিশীথে প্রেতের বুকে জাগে মৃত্যুভয় ॥

স্বপ্নপথ

আজ রাত্রে ভেঙে গেল ঘুম,
চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম,
তন্দ্রাঘোরে দেখিলাম চেয়ে
অবিরাম স্বপ্নপথ বেয়ে

চলিয়াছে দুরাশার স্রোত,
বুকে তার বহু ভগ্ন পোত।
বিফল জীবন যাহাদের,
তারাই টানিছে তার জের ;
অবিশ্রান্ত পৃথিবীর পথে,
জলে স্থলে আকাশে পর্বতে।
একদিন পথে যেতে যেতে
উষ্ণ বক্ষ উঠেছিল মেতে
যাহাদের, তারাই সংঘাতে
মৃত্যুমুখী, ব্যর্থ রক্তপাতে ॥

সুতরাং

এত দিন ছিল বাঁধা সড়ক,
আজ চোখে দেখি শুধু নরক !
এত আঘাত কি সইবে,
যদি না বাঁচি দৈবে ?
চারি পাশে লেগে গেছে মড়ক

বহুদিনকার উপার্জন,
আজ দিতে হবে বিসর্জন !
নিষ্ফল যদি পন্থা
সুতরাং ছেঁড়া কন্থা
মনে হয় শ্রেয় বর্জন ॥

বুদ্বুদ মাত্র

মৃত্যুকে ভুলেছ তুমি তাই,
তোমার অশান্ত মনে বিপ্লব বিরাজে সর্বদাই।
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুকে স্মরণ ক'রো মনে,
মুহূর্তে মুহূর্তে মিথ্যা জীবন ক্ষরণে,
তারি তরে পাতা সিংহাসন,
রাত্রি দিন অসাধ্য সাধন।
তবুও প্রচণ্ড-গতি জীবনের ধারা,
নিয়ত কালের কীর্তি দিতেছে পাহারা,
জন্মের প্রথম কাল হতে,
আমরা বুদ্বুদ মাত্র জীবনের স্রোতে।
এ পৃথিবী অত্যন্ত কুশলী,
যেখানে কীর্তির নামাবলী,
আমাদের স্থান নেই সেথা
আমরা শক্তের ভক্ত, নহি তো বিজেতা॥

আলো-অন্ধকার

দৃষ্টিহীন সন্ধ্যাবেলা শীতল কোমল অন্ধকার
স্পর্শ ক'রে গেল মোরে। স্বপনের গভীর চুম্বন,
ছন্দ-ভাঙা স্তব্ধতায় ভ্রান্তি এনে দিল চিরন্তন,
অহর্নিশি চিন্তা মোর বিক্ষুব্ধ হয়েছে ; প্রতিবার
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি অন্ধকারে মৃত্যুর বিস্তার।

মুহূর্ত কম্পিত-আমি বন্ধ করি অলৌকিক গান,
প্রচ্ছন্ন স্বপন মোর আক্ষরিক মিথ্যার পাষাণ ;
কঠিন প্রলুব্ধ চিন্তা নগরীতে নিস্ফল আমার।
তবু চাই রুদ্ধতায় আলোকের আদিম প্রকাশ,
পৃথিবীর গন্ধ নেই এমন দিবস বারোমাস।
আবার জাগ্রত মোর তুষ্ট চিন্তা নিগূঢ় ইঙ্গিতে ,
ভূঁইচাঁপা সুরভির মরণ অস্তিত্বময় নয়,
তার সাথে কল্পনার কখনো হবে না পরিচয় ;
তবু যেন আলো আর অন্ধকার মোর চারিভিতে ॥

প্রতিদ্বন্দ্বী

গন্ধ এনেছে তীব্র নেশায় ফেনিল মদির,
জোয়ার কি এল রক্ত নদীর ?
নইলে কখনো নিস্তার নেই বন্দীশালায়।
সচরাচর কি সামনা সামনি ধূর্ত পালায় ?
কাজ নেই আর বল্লাল সেন-ই আমলে,
মুক্তি পেয়েছি ধোঁয়াতে নিবিড় শ্যামলে,
তোমাতে আমাতে চিরদিন চলে দ্বন্দ্ব।
ঠাণ্ডা হাওয়ায় তীব্র বাঁশির ছন্দ
মনেরে জাগায় সাবধান হুঁশিয়ার !
খুঁজে নিতে হবে পুরাতন হাতিয়ার
পাণ্ডুর পৃথিবীতে।
আফিঙের ঘোর মেরু-বর্জিত শীতে

বিষাক্ত আর শিথিল আবেষ্টনে
তোমারে স্মরিছে মনে।
সন্ধান করে নিত্য নিভৃত রাতে
প্রতিদ্বন্দ্বী, উচ্ছল মদিরাতে॥

আমার মৃত্যুর পর

আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন,
বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লীর ঝংকারে
জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শঙ্কারে,
উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার-অঞ্জন।
পরিচয়ভারে ন্যুব্জ অনেকের শোকগ্রস্ত মন,
বিস্ময়ের জাগরণে ছদ্মবেশ নেবে বিলাপের
মুহূর্তে বিস্মৃত হবে সব চিহ্ন আমার পাপের
কিছুকাল সন্তর্পণে ব্যক্ত হবে সবার স্মরণ!

আমার মৃত্যুর পর, জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পৃষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর॥

স্বতঃসিদ্ধ

মৃত্যুর মৃত্তিকা 'পরে ভিত্তি প্রতিকূল—
সেখানে নিয়ত রাত্রি ঘনায় বিপুল ;
সহসা চৈত্রের হাওয়া ছড়ায় বিদায় :
স্তিমিত সূর্যের চোখে অন্ধকার ছায়।
বিরহ বন্যার বেগে প্রভাতের মেঘ
রাত্রির সীমায় এসে জানায় আবেগ,
ধূসর প্রপঞ্চ-বিশ্ব উন্মুক্ত আকাশে।
অনেক বিপন্ন স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে।
তবু তো প্রাণের মর্মে প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা
অজস্র ফুলের রাজ্যে বাঁধে লঘু বাসা ;
রাত্রির বিবর্ণ স্মৃতি প্রভাতের বুকে
ছড়ায় মলিন হাসি নিরর্থ-কৌতুকে ॥

মুহূর্ত

(ক)

এমন মুহূর্ত এসেছিল
একদিন আমার জীবনে
যে মুহূর্তে মনে হয়েছিল
সার্থক ভুবনে বেঁচে থাকা :
কালের আরণ্য পদপাত
ঘটেছিল আমার গুহায়।

জরাগ্রস্ত শীতের পাতারা
উড়ে এসেছিল কোথা থেকে,
সব কিছু মিশে একাকার
কাল-বোশেখীর পদার্পণে !
সেদিন হাওয়ায় জমেছিল
অদ্ভুত রোমাঞ্চ দিকে দিকে ;
আকাশের চোখে আশীর্বাদ,
চুক্তি ছিল আমৃত্যু জীবনে।
সে সব মুহূর্তগুলো আজো
প্রাণের অস্পষ্ট প্রশাখায়
ফোটায় সবুজ ফুল,
উড়ে আসে কাব্যের মৌমাছি।
অসংখ্য মুহূর্তে গ'ড়ে তোলা
স্বপ্ন-দুর্গ মুহূর্তে চুরমার।
আজ কক্ষচ্যুত ভাবি আমি
মুহূর্তকে ভুলে থাকা বৃথা ;—
যে মুহূর্ত অদৃশ্য প্লাবনে
টেনে নিয়ে যায় কক্ষান্তরে।
আজ আছি নক্ষত্রের দলে,
কাল জানি মুহূর্তের টানে
ভেসে যাব সূর্যের সভায়,
ক্ষুব্ধ কালো ঝড়ের জাহাজে ॥

মুহূর্ত

(খ)

মুহূর্তকে ভুলে থাকা বৃথা ;
যে মুহূর্ত
তোমার আমার আর অন্য সকলের
মৃত্যুর সূচনা,
যে মুহূর্ত এনে দিল আমার কবিতা
আর তোমার আগ্রহ।
এ মুহূর্তে সূর্যোদয়,
ও মুহূর্তে নক্ষত্রের সভা,
আর এক মুহূর্তে দেখি কালো ঝড়ে
সুস্পষ্ট সংকেত।
অনেক মুহূর্ত মিলে পৃথিবীর
বাড়াল ফসল,
মুহূর্তে মুহূর্তে তারপর
সে ফসলে ঘনালো উচ্ছেদ।
এমন মুহূর্ত এল আমার জীবনে,
যে মুহূর্ত চিরদিন মনে রাখা যায়—
অথচ আশ্চর্য কথা,
নতুন মুহূর্ত আর এক
সে মুহূর্তে ছড়ালো বিষাদ।

অনেক মুহূর্ত গেছে অনেক জীবনে,
যে সব মুহূর্ত মিলে
আমার কাব্যের শূন্য হাতে

ভরে দিত অক্ষয় সম্পদ।
কিন্তু আজ উষ্ণ-দ্বিপ্রহরে
আমার মুহূর্ত কাটে কাব্যরচনার
দুঃসহ চেষ্টায়।
হয়তো এ মুহূর্তেই অন্য কোনো কবি
কাব্যের অজস্র প্রেরণায়
উচ্ছ্বসিত, অথচ বাধার
উদ্ধত প্রাচীর মুখোমুখি।
এতএব মুহূর্তকে মনে রাখা ভাল
যে মুহূর্ত বৃথা ক্ষয় হয়॥

গোপন মুহূর্ত আজ এক
নিশ্ছিদ্র আকাশে
অবিরাম পূর্বাচল খুঁজে
ক্লান্ত হল অস্ফুট জীবনে,
নিঃসঙ্গ স্বপ্নের আসা-যাওয়া
ধূলিসাৎ—তাই আজ দেখি,
প্রত্যেক মুহূর্ত—অনাগত
মুহূর্তের রক্তিম কপোলে
তুলে ধরে সলজ্জ প্রার্থনা॥

তরঙ্গ ভঙ্গ

হে নাবিক, আজ কোন্ সমুদ্রে
এল মহাঝড়,
তারি অদৃশ্য আঘাতে অবশ
মরু-প্রান্তর।
এই ভুবনের পথে চলবার
শেষ-সম্বল
ফুরিয়েছে, তাই আজ নিরুক্ত
প্রাণ চঞ্চল।

আজ জীবনেতে নেই অবসাদ!
কেবল ধ্বংস, কেবল বিবাদ—
এই জীবনের একী মহা উৎকর্ষ!
পথে যেতে যেতে পায়ে পায়ে সংঘর্ষ।

২

(ছুটি আজ চাই ছুটি,
চাই আমাদের সকালে বিকালে দুটি
নুন-ভাত, নয় আধপোড়া কিছু রুটি।)
—একী অবসাদ ক্লান্তি নেমেছে বুকে,
তাইতো শক্তি হারিয়েছি আজ
দাঁড়াতে পারি না রুখে।
বন্ধু, আমরা হারিয়েছি বুঝি প্রাণধারণের শক্তি,
তাইতো নিঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।
এর চেয়ে ভাল মনে হয় আজ পুরনো দিন,
আমাদের ভাল পুরনো, চাই না বৃথা নবীন॥

আসন্ন আঁধারে

নিশুতি রাতের বুকে গলানো আকাশ ঝরে
দুনিয়ায় ক্লান্তি আজ কোথা ?

নিঃশব্দে তিমির স্রোত বিরক্ত-বিস্বাদে
প্রগল্‌ভ আলোর বুকে ফিরে যেতে চায়।
—তবে কেন কাঁপে ভীরু বুক ?
স্বেদ-সিক্ত ললাটের শেষ বিন্দুটুকু
প্রখর আলোর সীমা হতে
বিচ্ছিন্ন করেছে যেন সাহারার নীরব ইঙ্গিতে।
কেঁদেছিল পৃথিবীর বুক।
গোপনে নির্জনে
ধাবমান পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের কাছে
পেয়েছিল অতীত বারতা ?
মেরুদণ্ড জীর্ণ তবু বিকৃত ব্যথায়
বার বার আর্তনাদ করে
আহত বিক্ষত দেহ,—মুমূর্ষু চঞ্চল,
তবুও বিরাম কোথা ব্যগ্র আঘাতের।

প্রথম পৃথিবী আজ জ্বলে রাত্রিদিন
আবাল্যের সঞ্চিত দাহনে
চিরদিন দ্বন্দ্ব চলে জোয়ার ভাঁটায় ;
আষাঢ়ের ক্ষুব্ধ-ছায়া বসন্তের বুকে
এসে পড়েছিল একদিন—
উদ্‌ভ্রান্ত পৃথিবী তাই ছুটেছে পিছনে
আলোরে পশ্চাতে ফেলি, দূরে—বহু দূরে

যত দূরে দৃষ্টি যায়—
চেয়ে দেখি ঘিরেছে কুয়াশা।
উড়ন্ত বাতাসে আজ কুমেরু কঠিন
কোথা হতে নিয়ে এল জড়-অন্ধকার ;
—এই কি পৃথিবী ?
একদিন জ্বলেছিল বুকের জ্বালায়—
আজ তার শব দেহ নিঃস্পন্দ অসাড় ॥

পরিবেশন

সান্ধ্য ভিড় জমে ওঠে রেস্তোঁরার দুর্লভ আসরে,
অর্থনীতি, ইতিহাস সিনেমার পরিচ্ছন্ন পথে—
খুঁজে ফেরে অনন্তের বিলুপ্ত পর্যায়।
গন্ধহীন আনন্দের অন্তিম নির্যাস
এক কাপ চা-এ আর রঙিন সজ্জায়।
সম্প্রতি নীরব হল ; বিনিদ্র বাসরে
ধূমপান চলে : তবে ভবতরী তাস।
স্মৃতি-ভ্রষ্ট উঞ্ছজীবী চলে কোন মতে।

জড়-ভরতের দল বসে আছে পার্কের বেঞ্চিতে,
পবিত্র জাহ্নবী-তীরে প্রার্থী যত বেকার যুবক।
কতক্ষণ ? গঞ্জনার বড় তীব্র জ্বালা—
বিবাগী প্রাণের তবু গৃহগত টান।

ক্রমে গোঠে সন্ধ্যা নামে : অন্তরও নিরালা,
এই বার ফিরে চলো, ভাগ্য সবই মিতে ;
দূরে বাজে একটানা রেডিয়োর গান।
এখনো হয় নি শূন্য, ক্রমাগত বেড়ে চলে সখ।

ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে, আগমনী পশ্চিমা হাওয়ায়,
সুপ্রাচীন গুরুভক্তি আজো আনে উন্মত্ত লালসা।
চুপ করে বসে থাকো অন্ধকার ঘরে এক কোণে :—
রাম আর রাবণের উভয়েরই হাতে তীক্ষ্ণ কশা ॥

অসহ্য দিন

অসহ্য দিন ! স্নায়ু উদ্বেল ! শ্লথ পায়ে ঘুরি ইতস্তত
অনেক দুঃখে রক্ত আমার অসংযত !
মাঝে মাঝে যেন জ্বালা করে এক বিরাট ক্ষত
হৃদয়গত।
ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
দিন রাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে।
এখানে ওখানে, পথে চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত,
মনে হয় যেন জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত ॥

উদ্যোগ

বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।
ঘরে তোলো ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে,
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।
আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ করো শক্ত,
প্রতি ঘাসে ঘাসে বিদ্যুৎ আসে জাগে সাড়া অব্যক্ত।
আজকে মজুর হাতুড়ির সুর ক্রমশই করে দৃপ্ত,
আসে সংহতি ; শত্রুর প্রতি ঘৃণা হয় নিক্ষিপ্ত।
ভীরু অন্যায় প্রাণ-বন্যায় জেনো আজ উচ্ছেদ্য,
বিপন্ন দেশে তাই নিঃশেষে ঢালো প্রাণ দুর্ভেদ্য।
সব প্রস্তুত যুদ্ধের দূত হানা দেয় পূব-দরজায়,
ফেণী ও আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা গর্জায়।
বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত॥

পরাভব

হঠাৎ ফাল্গুনী হাওয়া ব্যাধিগ্রস্ত কলির সন্ধ্যায় :
নগরে নগররক্ষী পদাতিক পদধ্বনি শুনি ;—
দূরাগত স্বপ্নের কী দুর্দিন,—মহামারী, অন্তরে বিক্ষোভ-

অবসন্ন বিলাসের সংকুচিত প্রাণ।
ব্যক্তিত্বের গাত্রদাহ ; রন্ধ্রহীন স্বধর্ম বিকাশ,
অতীতের ভগ্ননীড় এইবার সুপুষ্ট সন্ধ্যায়।
বণিকের চোখে আজ কী দুরন্ত লোভ ঝ'রে পড়ে,—
বৈশাখের ঝড়ে তারই অস্পষ্ট চেতনা।
ক্ষয়িষ্ণু দিনেরা কাঁদে অনর্থক প্রসব ব্যথায়...
নশ্বর পৌষের দিন চারিদিকে ধূর্তের সমতা :
জটিল আবর্তে শুধু নৈমিত্তিক প্রাণের স্পন্দন।
গলিত উদ্যম তাই বৈরাগ্যের ভাণ,—
প্রকাশ্য ভিক্ষার ঝুলি কালক্রমে অত্যন্ত উদার ;
সংক্রামিত রক্ত-রোগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে।
শোকাচ্ছন্ন আমাদের সনাতন মন,
পৃথিবীর সম্ভাবিত অকাল মৃত্যুতে,
দুর্দিনের সমন্বয়, সম্মুখেতে অনন্ত প্রহর।
বিজিগীষা ?—সন্দিহান আগামী দিনেরা :
দৃষ্টিপথ অন্ধকার, (লাল-সূর্য মুক্তির প্রতীক ?
—আজ তবে প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্য বাসর।)

বিভীষণের প্রতি

আমরা সবাই প্রস্তুত আজ, ভীরু পলাতক !
লুপ্ত অধুনা এদেশে তোমার গুপ্তঘাতক,
হাজার জীবন বিকশিত এক রক্ত-ফুলে,
পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।

অভিজ্ঞতার আগুনে শুদ্ধ অতীত পাতক,
এখানে সবাই সংঘবদ্ধ, যে নবজাতক।

ক্রমশ এদেশে গুচ্ছবদ্ধ রক্ত-কুসুম
ছড়ায় শত্রু-শবের গন্ধ, ভাঙে ভীত ঘুম।
এখানে কৃষক বাড়ায় ফসল মিলিত হাতে,
তোমার স্বপ্ন চূর্ণ করার শপথ দাঁতে,
যদিও নিত্য মূর্খ বাধার ব্যর্থ জুলুম :
তবু শত্রুর নিধনে লিপ্ত বাসনার ধুম।

মিলিত ও ক্ষত পায়ের রক্ত গড়ে লালপথ,
তাইতো লক্ষ মুঠিতে ব্যক্ত দৃঢ় অভিমত।
ক্ষুধিত প্রাণের অক্ষরে লেখা, "প্রবেশ নিষেধ,
এখানে সবাই ভুলেছে দ্বন্দ্ব, ভুলেছে বিভেদ।"
দুর্ভিক্ষ ও শত্রুর শেষ হবে যুগপৎ,
শোণিত ধারার উষ্ণ ঐক্যে ঘনায় বিপদ ॥

জাগবার দিন আজ

জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে ;
যাদের চোখেতে আজো স্বপ্নের ছায়া ছবি ভাসছে-
তাদেরই যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশী জানবে,
মৃত্যুর সঙ্গীন তাদেরই বুকেতে শেল হানবে।

আজকের দিন নয় কাব্যের—
আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের ;
শরতের অবকাশে শোনা যায় আকাশের বাঁশরী,
কিন্তু বাঁশরী বৃথা, জমবে না আজ কোনো আসর-ই।
আকাশের প্রান্তে যে মৃত্যুর কালো পাখা বিস্তার—
মৃত্যু ঘরের কোণে, আজ আর নেই জেনো নিস্তার ;
মৃত্যুর কথা আজ ভাবতেও পাও বুঝি কষ্ট,
আজকের এই কথা জানি লাগবেই অস্পষ্ট,
তবুও তোমার চাই চেতনা,
চেতনা থাকলে আজ দুর্দিন আশ্রয় পেত না,
আজকে রঙিন খেলা নিষ্ঠুর হাতে করো বর্জন,
আজকে যে প্রয়োজন প্রকৃত দেশপ্রেম অর্জন ;
তাই এসো চেয়ে দেখি পৃথ্বী—
কোনখানে ভাঙে আর কোনখানে গড়ে তার ভিত্তি।
কোনখানে লাঞ্ছিত মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব,
কোনখানে দানবের 'মরণ-যজ্ঞ' চলে নিত্য ;
পণ করো, দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই এক সঙ্গে ;
সংগ্রাম শুরু করো মুক্তির,
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।
আজকে শপথ করো সকলে
বাঁচাব আমার দেশ, যাবে না তা শত্রুর দখলে ;
তাই আজ ফেলে দিয়ে তুলি আর লেখনী,
একতাবদ্ধ হও এখনি ॥

ঘুমভাঙার গান

মাথা তোল তুমি বিন্ধ্যাচল,
মোছ উদ্‌গত অশ্রুজল
যে গেল সে গেল, ভেবে কি ফল ?
ভোল ক্ষত !

তুমি প্রতারিত বিন্ধ্যাচল,
বোঝ নি ধূর্ত চতুর ছল,
হাসে যে আকাশচারীর দল,
অনাহত।

শোন অবনত বিন্ধ্যাচল,
তুমি নও ভীরু বিগত বল
কাঁপে অবাধ্য হৃদয়দল
অবিরত।

কঠিন, কঠোর, বিন্ধ্যাচল,
অনেক ধৈর্যে আজো অটল
ভাঙো বিঘ্নকে : করো শিকল
পদাহত।

বিশাল, ব্যাপ্ত বিন্ধ্যাচল,
দেখ সূর্যের দর্পানল ;
ভুলেছে তোমার দৃঢ় কবল
বাধা যত।

সময় যে হল বিন্ধ্যাচল,
ছেঁড়ে আকাশের উঁচু ত্রিপল
দ্রুত বিদ্রোহে হানো উপল
শত শত ॥

হদিশ

আমি সৈনিক, হাঁটি যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রভাতী আলোয়, অনেক ক্লান্ত দিনের পরে,
অজ্ঞাত এক প্রাণের ঝড়ে।

বহু শতাব্দী ধরে লাঞ্ছিত, পাই নি ছাড়া
বহু বিদ্রোহ দিয়েছে মনের প্রান্ত নাড়া
তবু হতবাক্ দিই নি সাড়া!

আমি সৈনিক, দাসত্ব কাঁধে যুদ্ধে যেতে
দেখেছি প্রাণের উচ্ছ্বাস দূরে ধানের ক্ষেতে
তবু কেন যেন উঠি নি মেতে।

কত সান্ত্বনা খুঁজেছি আকাশে গভীর নীলে
শুধু শূন্যতা এনেছে বিষাদ এই নিখিলে
মূঢ় আতঙ্ক জন-মিছিলে।

ক্ষতবিক্ষত চলেছি হাজার, তবুও একা
সামনে বিরাট শত্রু পাহাড় আকাশ-ঠেকা
কোন সূর্যের পাই নি দেখা।

অনেক রক্ত দিয়েছি বিমূঢ় বিনা কারণে,
বিরোধী স্বার্থ করেছি পুষ্ট অযথা রণে ;
সঙ্গীবিহীন প্রাণধারণে।

ভীরু সৈনিক করেছি দলিত কত বিক্ষোভ
ইন্ধন চেয়ে যখনি জ্বলেছে কুবেরীর লোভ
দিয়েছি তখনি জন-খাণ্ডব।

একদা যুদ্ধ শুরু হল সারা বিশ্ব জুড়ে,
জগতের যত লুণ্ঠনকারী আর মজুরে,
চঞ্চল দিন ঘোড়ার খুরে।

উঠি উদ্ধত প্রাণের শিখরে, চারিদিকে চাই
এল আহ্বান জন-পুঞ্জের শুনি রোশনাই
দেখি ক্রমাগত কাছে উৎরাই।

হাতছানি দিয়ে গেল শস্যের উন্নত শীষ,
জনযাত্রায় নতুন হদিশ—
সহসা প্রাণের সবুজে সোনার দৃঢ় উষ্ণীষ॥

দেয়ালিকা

এক

দেঁয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা।
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা॥

দুই

সকালে বিকালে মনের খেয়ালে
ইঁদারায়
দাঁড়িয়ে থাকলে অর্থটা তার
কি দাঁড়ায়?

তিন

কখন বাজল ছ'টা
প্রাসাদে প্রাসাদে ঝল্‌সায় দেখি
শেষ সূর্যের ছটা—
স্তিমিত দিনের উদ্ধত ঘনঘটা॥

চার

বেজে চলে রেডিও
সর্বদা গোলমাল করতেই
'রেডি' ও॥

পাঁচ

জাপানী গো জাপানী
ভারতবর্ষে আসতে কি শেষ
ধরে গেল হাঁপানী ?

ছয়

জার্মানী গো জার্মানী
তুমি ছিলে অজেয় বীর
এ কথা আজ আর মানি ?

সাত

হে রাজকন্যে
তোমার জন্যে
এ জনারণ্যে
নেইকো ঠাঁই—
জানাই তাই ॥

আট

আঁধিয়ারে কেঁদে কয় সল্‌তে :
'চাইনে চাইনে আমি জ্বলতে ॥'

প্রথম বার্ষিকী

'আরবার ফিরে এল বাইশে শ্রাবণ।
আজ বর্ষশেষে হে অতীত,
কোন সম্ভাষণ
জানাব অলক্ষ্য পানে ?
ব্যথাক্ষুব্ধ গানে,
ঝরাব শ্রাবণ বরিষণ !
দিনে দিনে, তিলে তিলে যে বেদনা
উদাস মধুর
হয়েছে নিঃশব্দ প্রাণে
ভরেছে বিপুল টানে,
তারে আজ দেব কোন সুর ?
তোমার ধূসর স্মৃতি, তোমার কাব্যের সুরভিতে
লেগেছে সন্ধ্যার ছোঁওয়া, প্রাণ ভরে দিতে
হেমন্তের শিশিরের কণা
আমি পারিব না।
প্রশান্ত সূর্যাস্ত পরে দিগন্তের যে রাগ-রক্তিমা,
লেগেছে প্রাণের 'পরে,
সহসা স্মৃতির ঝড়ে
মুছিয়া যাবে কী তার সীমা !
তোমার সন্ধ্যার ছায়াখানি
কোন পথ হতে মোরে
কোন পথে নিয়ে যাবে টানি'
অমর্ত্যের আলোক সন্ধানী
আমি নাহি জানি।

একদা শ্রাবণ দিনে গভীর চরণে,
নীরবে নিষ্ঠুর সরণিতে
পাদস্পর্শ দিতে
ভিক্ষুক মরণে
পেয়েছ পথের মধ্যে দিয়েছ অক্ষয়
তব দান,
হে বিরাট প্রাণ।
তোমার চরণ স্পর্শে রোমাঞ্চিত পৃথিবীর ধূলি
উঠিছে আকুলি',
আজিও স্মৃতির গন্ধে ব্যথিত জনতা
কহিছে নিঃশব্দ স্বরে একমাত্র কথা,
"তুমি হেথা নাই"।
বিস্ময়ের অন্ধকারে মুহ্যমান জলস্থল তাই
আধো তন্দ্রা, আধো জাগরণে
দক্ষিণ হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে
ফেলিছে নিঃশ্বাস।
ক্লেদক্লিষ্ট পৃথিবীতে একী পরিহাস!
তুমি চলে গেছ তবু আজিও বহিছে বারোমাস
উদ্দাম বাতাস,
এখনো বসন্ত আসে
সকরুণ বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে,
এখনো শ্রাবণ ঝরোঝর
অবিশ্রান্ত মাতায় অন্তর।
এখনো কদম্ব বনে বনে
লাগে দোলা মত্ত সমীরণে
এখনো উদাসি'

শরতে কাশের ফোটে হাসি।
জীবনে উচ্ছ্বাস, হাসি গান
এখনো হয় নি অবসান।
এখনো ফুটিছে চাঁপা হেনা,
কিছুই তো তুমি দেখিলে না।
তোমার কবির দৃষ্টি দিয়ে
কোনো কিছু দিলে না চিনিয়ে।
এখন আতঙ্ক দেখি পৃথিবীর অস্থিতে মজ্জায়,
সভ্যতা কাঁপিছে লজ্জায় ;
স্বার্থের প্রাচীরতলে মানুষের সমাধি রচনা,
অযথা বিভেদ সৃষ্টি, হীন প্ররোচনা
পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতে,
মিথ্যা ছলনাতে—
আজিকার মানুষের জয় ;
প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময়॥

তারুণ্য

হে তারুণ্য, জীবনের প্রত্যেক প্রবাহ
অমৃতের স্পর্শ চায় ; অন্ধকারময়
ত্রিকালের কারাগৃহ ছিন্ন করি'
উদ্দাম গতিতে বেদনা-বিদ্যুৎ-শিখা
জ্বালাময় আত্মার আকাশে, ঊর্ধ্বমুখী
আপনারে দগ্ধ করে প্রচণ্ড বিস্ময়ে।

জীবনের প্রতি পদক্ষেপ তাই বুঝি
ব্যথাবিদ্ধ বিষণ্ণ বিদায়ে। রক্তময়
দ্বিপ্রহরে অনাগত সন্ধ্যার আভাসে
তোমার অক্ষয় বীজ অঙ্কুরিত যবে
বিষ-মগ্ন রাত্রিবেলা কালের হিংস্রতা
কণ্ঠরোধ করে অবিশ্বাসে। অগ্নিময়
দিনরাত্রি মোর ; আমি যে প্রভাতসূর্য
স্পর্শহীন অন্ধকারে চৈতন্যের তীরে
উন্মাদ, সন্ধান করি বিশ্বের বন্যায়
সৃষ্টির প্রথম সুর। বজ্রের ঝংকারে
প্রচণ্ড ধ্বংসের বার্তা আমি যেন পাই
মুক্তির পুলক-লুব্ধ বেগে একী মোর
প্রথম স্পন্দন! আমার বক্ষের মাঝে
প্রভাতের অস্ফুট কাকলি, হে তারুণ্য,
রক্তে মোর আজিকার বিদ্যুৎ-বিদায়
আমার প্রাণের কণ্ঠে দিয়ে গেল গান ;
বক্ষে মোর পৃথিবীর সুর। উচ্ছ্বসিত
প্রাণে মোর রোমাঞ্চিত আদিম উল্লাস।
আমি যেন মৃত্যুর প্রতীক। তাণ্ডবের
সুর যেন নৃত্যময় প্রতি অঙ্গে মোর,
সম্মুখীন সৃষ্টির আশ্বাসে। মধ্যাহ্নের
ধ্যান মোর মুক্তি পেল তোমার ইঙ্গিতে।
তারুণ্যের ব্যর্থ বেদনায় নিমজ্জিত
দিনগুলি যাত্রা করে সম্মুখের টানে।
নৈরাশ্য নিঃশ্বাসে ক্ষত তোমার বিশ্বাস
প্রতিদিন বৃদ্ধ হয় কালের কর্দমে!

হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রী সঙ্গীত বিহীন,
আকাশের স্বপ্ন মাঝে রাত্রির জিজ্ঞাসা
'ক্ষয় হয়ে যায়। নিভৃত ক্রন্দনে তাই
পরিশ্রান্ত সংগ্রামের দিন। বহ্নিময়
দিনরাত্রি চক্ষে মোর এনেছে অন্তিম।
ধ্বংস হোক, লুপ্ত হোক ক্ষুধিত পৃথিবী
আর সর্পিল সভ্যতা। ইতিহাস
স্তুতিময় শোকের উচ্ছ্বাস! তবু আজ
তারুণ্যের মুক্তি নেই, মুমূর্ষু মানব।
প্রাণে মোর অজানা উত্তাপ অবিরাম
মুগ্ধ করে পুষ্টিকর রক্তের সঙ্কেতে!
পরিপূর্ণ সভ্যতা সঞ্চয়ে আজ যারা
রক্তলোভী বর্ধিত প্রলয় অন্বেষণে,
তাদের সংহার করো মৃতের মিনতি।
অন্ধ তমিস্রার স্রোতে দূরগামী দিন
আসন্ন রক্তের গন্ধে মূর্ছিত সভয়ে।
চলেছে রাত্রির যাত্রী আলোকের পানে
দূর হতে দূরে। বিফল তারুণ্য-স্রোতে
জরাগ্রস্ত কিশলয় দিন। নিত্যকার
আবর্তনে তারুণ্যের উদ্গত উদ্যম
বার্ধক্যের বেলাভূমি 'পরে অতর্কিতে
স্তব্ধ হয়ে যায়। তবু, হায়রে পৃথিবী,
তারুণ্যের মর্মকথা কে বুঝাবে তোরে!
কালের গহ্বরে খেলা করে চিরকাল
বিস্ফোরণহীন। স্তিমিত বসন্তবেগ
নিরুদ্দেশ যাত্রা করে জোয়ারের জলে।

অন্ধকার, অন্ধকার, বিভ্রান্ত বিদায় ;
নিশ্চিত ধ্বংসের পথে ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবী।
বিকৃত বিশ্বের বুকে প্রকম্পিত ছায়া
মরণের, নক্ষত্রের আহ্বানে বিহ্বল
তারুণ্যের হৃৎপিণ্ডে বিদীর্ণ বিলাস।
ক্ষুব্ধ অন্তরের জ্বালা, তীব্র অভিশাপ ;
পর্বতের বক্ষমাঝে নির্ঝর-গুঞ্জনে
উৎস হতে ধাবমান দিক্‌-চক্রবালে।
সম্মুখের পানপাত্রে কী দুর্বার মোহ,
তবু হায় বিপ্রলব্ধ রিক্ত হোমশিখা!
মত্ততায় দিক্‌ভ্রান্তি, প্রাণের মঞ্জরী
দক্ষিণের গুঞ্জরণে নিষ্ঠুর প্রলাপে
অস্বীকার করে পৃথিবীরে। অলক্ষিতে
ভূমিলগ্ন আকাশকুসুম ঝরে যায়
অস্পষ্ট হাসিতে। তারুণ্যের নীলরক্ত
সহস্র সূর্যের স্রোতে মৃত্যুর স্পর্ধায়
ভেসে যায়·দিগন্ত আঁধারে। প্রত্যুষের
কালো পাখি গোধূলির রক্তিম ছায়ায়
আকাশের বার্তা নিয়ে বিনিদ্র তারার
বুকে ফিরে গেল নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।
দিনের পিপাসু দৃষ্টি, রাত্রি ঝরে
বিবর্ণ পথের চারিদিকে। ভয়ঙ্কর
দিনরাত্রি প্রলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বে লীন ;
তারুণ্যের প্রত্যেক আঘাতে কম্পমান
উর্বর-উচ্ছেদ। অশরীরী আমি আজ
তারুণ্যের তরঙ্গের তলে সমাহিত

উত্তপ্ত শয্যায়।   ক্রমাগত শতাব্দীর
বন্দী আমি অন্ধকারে কেন খুঁজে ফিরি
অদৃশ্য সূর্যের দীপ্তি উচ্ছিষ্ট অন্তরে।
বিদায় পৃথিবী আজ, তারুণ্যের তাপে
নিবদ্ধ পথিক-দৃষ্টি উদ্বুদ্ধ আকাশে
সার্থক আমার নিত্য-লুপ্ত পরিক্রমা
ধ্বনিময় অনন্ত প্রান্তরে।   দূরগামী
আমি আজ উদ্বেলিত পশ্চাতের পানে
উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি রেখে যাই
সম্মুখের ডাকে।   শাশ্বত ভাস্বর পথে
আমার নিষিদ্ধ আয়োজন, হিমাচ্ছন্ন
চক্ষে মোর জড়তার ঘন অন্ধকার।
হে দেবতা আলো চাই, সূর্যের সঞ্চয়
তারুণ্যের রক্তে মোর কী নিঃসীম জ্বালা!
অন্ধকার-অরণ্যের উদ্দাম উল্লাস
লুপ্ত হোক আশঙ্কায় উদ্ধত মৃত্যুতে॥

মৃত পৃথিবী

পৃথিবী কি আজ শেষে নিঃস্ব
ক্ষুধাতুর কাঁদে সারা বিশ্ব,
চারিদিকে ঝরে পড়া রক্ত,
জীবন আজকে উত্যক্ত।

আজকের দিন নয় কাব্যের
পরিণাম আর সম্ভাব্যের
ভয় নিয়ে দিন কাটে নিত্য,
জীবনে গোপন-দুর্বৃত্ত।
তাইতো জীবন আজ রিক্ত,
অলস হৃদয় স্বেদসিক্ত :
আজকে প্রাচীর গড়া ভিন্ন
পৃথিবী ছড়াবে ক্ষতচিহ্ন।
অগোচরে নামে হিম-শৈত্য,
কোথায় পালাবে মরু দৈত্য ?
জীবন যদিও উৎক্ষিপ্ত,
তবু তো হৃদয় উদ্দীপ্ত,
বোধহয় আগামী কোনো বন্যায়,
ভেসে যাবে অনশন, অন্যায়॥

দুর্মর

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলা দেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,

গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলা দেশের প্রাণ।

"হয় ধান নয় প্রাণ" এ শব্দে
সারা দেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।

সাবাস, বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয় :
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলা দেশের প্রাণ॥

গীতি-গুচ্ছ

১

ওগো কবি তুমি আপন ভোলা,
আনিলে তুমি নিথর জলে ঢেউয়ের দোলা !
মালাখানি নিয়ে মোর
একী বাঁধিলে অলখ ডোর !
নিবেদিত প্রাণে গোপনে তোমার কী সুর
তোলা !
জেনেছ তো তুমি অজানা প্রাণের
নীরব কথা !
তোমার বাণীতে আমার মনের
এ ব্যাকুলতা—
পেয়েছ কী তুমি সাঁঝের বেলাতে,
যখন ছিলাম কাজের খেলাতে
তখন কী তুমি এসেছিলে—
ছিল দুয়ার খোলা ॥

২

এই নিবিড় বাদল দিনে
কে নেবে আমায় চিনে,
জানিনে তা।
এই নব ঘন ঘোরে,
কে ডেকে নেবে মোরে

কে নেবে হৃদয় কিনে,
উদাসচেতা ?
পবন যে গহন ঘুম আনে,
তার বাণী দেবে কী কানে,
যে আমার চিরদিন
অভিপ্রেতা।
শ্যামল রঙ বনে বনে,
উদাস সুর মনে মনে,
অদেখা বাঁধন বিনে
ফিরে কি আসবে হেথা ?

৩

গানের সাগর পাড়ি দিলাম
সুরের তরঙ্গে,
প্রাণ ছুটেছে নিরুদ্দেশে
ভাবের তুরঙ্গে।
আমার আকাশ মীড়ের মূর্ছনাতে
উধাও দিনে রাতে ;
তান তুলেছে অন্তবিহীন
রসের মৃদঙ্গে।
আমি কবি সপ্তসুরের ডোরে,
মগ্ন হলাম অতল ঘুম-ঘোরে ;

জয় করেছি জীবনে শঙ্কারে,

মোর বীণা ঝংকারে ;

গানের পথের পথিক আমি

সুরেরই সঙ্গে ॥

৪

হে মোর মরণ, হে মোর মরণ !

বিদায় বেলা আজ একেলা

দাও গো শরণ।

তুমি আমার বেদনাতে

দাও আলো আজ এই ছায়াতে

ফোটার গন্ধে অলস ছন্দে

ফেলিও চরণ ॥

তোমার বুকে অজানা স্বাদ,

ক্লান্তি আনো, দাও অবসাদ ;

তোমায় আমি দিবসযামী

করিনু বরণ

তোমার পায়ে কী আছে যে,

জীবনবীণা উঠেছে বেজে ?

আমায় তুমি নীরব চুমি

করিও হরণ ॥

৫

দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে
যেয়ো না চলে,
অরুণ-আলো কে যে দেবে
যাও গো বলে।
ফেরো তুমি যাবার বেলা,
সাঁঝ আকাশে রঙের মেলা
দেখছ কী কেমন ক'রে
আগুন হয়ে উঠল জ্বলে।
পূব গগনের পানে বারেক তাকাও,
বিরহেরই ছবি কেন আঁকাও ?
আঁধার যেন প্লাবন সম আসছে বেগে
শেষ হয়ে যাক তারা তোমার
ছোঁয়াচ লেগে।
থামো ওগো, যেয়ো না হয়
সময় হলে ॥

৬

শয়ন শিয়রে ভোরের পাখির রবে
তন্দ্রা টুটিল যবে।
দেখিলাম আমি খোলা বাতায়নে
তুমি আনমনা কুসুম চয়নে

অন্তর মোর ভরে গেল সৌরভে।
সন্ধ্যায় যবে ক্লান্ত পাখিরা ধীরে,
ফিরিছে আপন নীড়ে,
দেখিলাম তুমি এলে নদীকূলে
চাহিলে আমায় ভীরু আঁখি তুলে
হৃদয় তখনি উড়িল অজানা নভে॥

৭

ও কে যায় চলে কথা না বলে দিও না যেতে,
তাহারই তরে আসন ঘরে রেখেছি পেতে।
কেন সে সুধার পাত্র ফেলে
চলে যেতে চায় আজ অবহেলে
রামধনু রথে বিদায়ের পথে উঠিছে মেতে॥

রঙে রঙে আজ গোধূলি গগন,
নহেকো রঙিন, বিলাপে মগন।
আমি কেঁদে কই যেয়ো না কোথাও,
সে যে হেসে কয় মোরে যেতে দাও,
বাড়ায়ে বাহু বিরহ-রাহু চাহিছে পেতে॥

৮

হে পাষাণ, আমি নির্ঝরিণী
তব হৃদয়ে দাও ঠাঁই।
আমার কল্লোলে
নিঠুর যায় গ'লে
ঢেউয়েতে প্রাণ দোলে,
—তবু নীরব সদাই!
আমার মর্মেতে কী গান ওঠে মেতে
জানো না তুমি তা,
তোমার কঠিন পায় চির দিবসই হায়
রহিনু অবনতা।
যতই কাছে আসি,
আমারে মৃদু হাসি
করিছ পরবাসী,
তোমাতে প্রেম নাই॥

৯

শীতের হাওয়া ছুঁয়ে গেল ফুলের বনে,
শিউলি-বকুল উদাস হল ক্ষণে ক্ষণে,
ধূলি-ওড়া পথের 'পরে
বনের পাতা শীতের ঝড়ে
যায় ভেসে ক্ষীণ মলিন হেসে আপন মনে।

রাতের বেলা বইল বাতাস নিরুদ্দেশে,
কাঁপনটুকু রইল শুধু বনের শেষে ।•
কাশের পাশে হিমের হাওয়া,
কেবল তারি আসা-যাওয়া—
সব-ঝরাবার মন্ত্রণা সে দিল শুধুই সংগোপনে ॥

১০

কিছু দিয়ে যাও এই ধূলিমাখা পান্থশালায়,
কিছু মধু দাও আমার বুকের ফুলের মালায় ।
কত জন গেল এ পথ দিয়ে
আমার বুকের সুবাস নিয়ে
কিছু ধন তারা দিয়ে গেল মোর সোনার থালায় ।

পথ চেয়ে আমি বসে আছি হেথা তোমার আশে
তুমি এলে যদি কাছে বসো প্রিয় আমার পাশে ।
কিছু কথা বল আমার সনে,
ঢেউ তুলে যাও নীরব মনে,
এইটুকু শুধু দাও তুমি ওগো আমার ডালায় ॥

১১

ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি কর ক্ষমা,
মুক্তি দাও হে এ-মরু তরুরে, প্রিয়তমা।
ছিন্ন কর এ গ্রন্থিডোর
রিক্ত হয়েছে চিত্ত মোর
নেমেছে আমার হৃদয়ে শ্রান্তি ঘন-অমা।

যে আসব ছিল তোমার পাত্রে,
শোষণ করেছি দিনে ও রাত্রে।
রসের সিন্ধু মন্থন শেষে,
গরল উঠেছে তব উদ্দেশে,
তুমি আর নহ আমার অতীত, হে মনোরমা

১২

সাঁঝের আঁধার ঘিরল যখন
শাল-পিয়ালের বন,
তারই আভাস দিল আমায়
হঠাৎ সমীরণ।
কুটির ছেড়ে বাইরে এসে দেখি
আকাশকোণে তারার লেখালেখি
শুরু হয়ে গেছে বহুক্ষণ।

আজকে আমার মনের কোণে
কে দিল যে গান,
ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠি
রোমাঞ্চিত প্রাণ।
আকাশতলে বিমুক্ত প্রান্তরে,
উধাও হয়ে গেলাম ক্ষণ তরে!
কার ইশারায় হলাম অন্যমন॥

১৩

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী মঞ্জুল মঞ্জীর ধ্বনি,
মম অন্তর-প্রাঙ্গণে আসন্ন হল আগমনী।
ঘুমভাঙা উদ্বেল রাতে,
আধ-ফোটা ভীরু জ্যোৎস্নাতে
কার চরণের ছোঁয়া হৃদয়ে উঠিল রণরণি।

মেঘ-অঞ্জন-ঘন কার এই আঁখি পাতে লিখা,
বন্দন-নন্দিত উৎসবে জ্বালা দীপশিখা।
মুকুলিত আপনার ভারে
টলিয়া পড়িছে বারে বারে
সংগীত হিল্লোলে কে সে স্বপনের অগ্রণী॥

১৪

মেঘ-বিনিন্দিত স্বরে—

কে তুমি আমারে ডাকিলে শ্রাবণ বাতাসে ?

তোমার আহ্বান ধ্বনি—

পরশিয়া মোরে গরজিল দূর আকাশে ।

বেদনা বিভোল আমি

ক্ষণেক দুয়ারে থামি

বাহিরে ধূসর দিনে—

ছুটে চলি পথে মন্দির-বিবশ নিশাসে ।

মেঘে মেঘে ছাওয়া মলিন গগনে,

কোন আয়োজন ছিল আনমনে !

বাহিরে কী ঘনঘটা,

ভিতরে বিজলী-ছটা

মত্ত ভিতরে বাহিরে—

আজ কি কাটিবে বিরহ বিধুর হতাশে ॥

১৫

গুঞ্জরিয়া এল অলি ;

যেথা নিবেদন অঞ্জলি ।

পুষ্পিত কুসুমের দলে

গুনগুন গুঞ্জিয়া চলে

দলে দলে যেথা ফোটা-কলি।

আমার পরাণে ফুল ফুটিল যবে,
তখন মেতেছি আমি কী উৎসবে।
আজ মোর ঝরিবার পালা,
সব মধু হয়ে গেছে ঢালা ;
আজ মোরে চলে যেও দলি॥

১৬

কোন অভিশাপ নিয়ে এল এই
বিরহ বিধুর-আষাঢ়।
এখানে বুঝি বা শেষ হয়ে গেছে
উচ্ছল ভালবাসার।
বিরহী যক্ষ রামগিরি হতে
পাঠাল বারতা জলদের স্রোতে
প্রিয়ার কাছেতে জানাতে চাহিল
সব শেষ সব আশার॥

আমার হৃদয়ে এল বুঝি সেই মেঘ,
সেই বিহ্বল পর্বত-উদ্বেগ।
তাই এই ভরা বাদল আঁধারে
মন উন্মন হল বারে বারে

হৃদয় তাইতো সমুখীন হল
বিপুল সর্বনাশার

১৭

ভুল হল বুঝি এই ধরণীতলে,
তাই প্রাণে চিরকাল আগুন জ্বলে
তাই আগুন জ্বলে
দিনের শেষে
এক প্লাবন এসে
জানি ঘিরিবে আমার মন কৌতূহলে,
নব কৌতূহলে।
আমার জীবনে ভুল ছিল না বুঝি,
তাই বারে বারে সে আমারে গিয়াছে খুঁজি
দিনের শেষে
আজ বাউল বেশে
ঘুচাব মনের ভুল নয়ন জলে,
মোর নয়ন জলে॥

১৮

মুখ তুলে চায় সুবিপুল হিমালয়,
আকাশের সাথে প্রণয়ের কথা কয়,
আকাশ কহিছে ডেকে,
কথা কও কোথা থেকে ?
তুমি যে ক্ষুদ্র মোর কাছে মনে হয় ॥

হিমালয় তাই মূর্ছিত অভিমানে,
সে কথা কেহ না জানে।
ব্যর্থ প্রেমের ভারে
দীর্ঘ নিশাস ছাড়ে --
হিমালয় হতে তুষারের ঝড় বয় ॥

১৯

ফোটে ফুল আসে যৌবন
সুরভি বিলায় দোঁহে
বসন্তে জাগে ফুলবন
অকারণে যায় বহে ॥

কোনো এককাল মিলনে,
বিশ্বেরে অনুশীলনে

কাটে জানি জানি অনুক্ষণ
অতি অপরূপ মোহে ॥

ফুল ঝরে আর যৌবন চলে যায়,
বার বার তারা 'ভালবাসো' বলে যায়
তারপর কাটে বিরহে,
শূন্য শাখায় কী রহে
সে কথা শুধায় কোন মন ?
'তুমি বৃথা' যায় কহে ॥

মিঠেকড়া

অতি কিশোরের ছড়া

তোমরা আমায় নিন্দে ক'রে দাও না যতই গালি,
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চুনকালি।
কোনো কাজটাই পারি নাকো বলতে পারি ছড়া,
পাশের পড়া পড়ি না ছাই পড়ি ফেলের পড়া।
তেতো ওষুধ গিলি নাকো, মিষ্টি এবং টক,
খাওয়ার দিকেই জেনো আমার চিরকালের সখ।
বাবা-দাদা সবার কাছেই গোঁয়ার এবং মন্দ,
ভালো হয়ে থাকার সঙ্গে লেগেই আছে দ্বন্দ্ব।
পড়তে ব'সে থাকে আমার পথের দিকে চোখ,
পথের চেয়ে পথের লোকের দিকেই বেশী ঝোঁক।
হুলের কেয়ার করি নাকো মধুর জন্যে ছুটি,
যেখানে ভিড় সেইখানেতেই লাগাই ছুটোছুটি।
পণ্ডিত এবং বিজ্ঞজনের দেখলে মাথা নাড়া,
ভাবি উপদেশের ষাঁড়ে করলে বুঝি তাড়া।
তাইতো ফিরি ভয়ে ভয়ে, দেখলে পরে তর্ক,
বুঝি কেবল গোময় সেটা,—নয়কো মধুপর্ক।
ভুল করি ভাই যখন তখন, শোধরাবার আহ্লাদে,
খেয়ালমতো কাজ ক'রে যাই, কষ্ট পাই কি সাধে ?
সোজাসুজি যা হয় বুঝি, হায় অদৃষ্ট চক্র!
আমার কথা বোঝে না কেউ, পৃথিবীটাই বক্র॥

এক যে ছিল

এক যে ছিল আপনভোলা কিশোর,
ইস্কুল তার ভাল লাগত না,
সহ্য হত না পড়াশুনার ঝামেলা
আমাদের চলতি লেখাপড়া সে শিখল না কোনোকালেই,
অথচ সে ছাড়িয়ে গেল সারা দেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

বড়মানুষীর মধ্যে গরীবের মতো মানুষ,
তাই বড় হয়ে সে বড়মানুষ না হয়ে
মানুষ হিসেবে হল অনেক বড়।
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

গানসাধার বাঁধা আইন সে মানে নি,
অথচ স্বর্গের বাগান থেকে সে চুরি ক'রে আনল
তোমার আমার গান।
কবি সে, ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল না ছোট বয়সে,
অথচ শিল্পী ব'লে সে-ই পেল শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মান।
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

মানুষ হল না ব'লে যে ছিল তার দিদির আক্ষেপের বিষয়,
অনেক দিন, অনেক বিদ্রূপ যাকে করেছে আহত ;
সে-ই একদিন চমক লাগিয়ে করল দিগ্বিজয়।

কেউ তাকে বলল, ‘বিশ্বকবি’, কেউ বা ‘কবিগুরু’
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারদিক করল প্রণাম।
তাই পৃথিবী আজো অবাক হয়ে তাকিয়ে বলছে :
কেমন ক’রে? সে প্রশ্ন আমাকে ক’রো না,
এ প্রশ্নের জবাব তোমাদের মতো আমিও খুঁজি॥

ভেজাল

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়।
ভেজাল তেল আর ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর ময়দা,
‘কৌন ছোড়ে গা ভেজাল ভেইয়া, ভেজালসে হ্যয় ফয়দা।’
ভেজাল পোশাক ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।
ভেজাল কথা—বাংলাতে ইংরেজী ভেজাল চলছে,
ভেজাল দেওয়া সত্যি কথা লোকেরা আজ বলছে।
‘খাঁটি জিনিস’ এই কথাটা রেখো না আর চিত্তে,
‘ভেজাল’ নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।
কলিতে ভাই ‘ভেজাল’ সত্য ভেজাল ছাড়া গতি নেই,
ছড়াটাতেও ভেজাল দিলাম, ভেজাল দিলে ক্ষতি নেই॥

গোপন খবর

শোনো একটা গোপন খবর দিচ্ছি আমি তোমায়,
কলকাতাটা যখন খাবি খাচ্ছিল রোজ বোমায়,
সেই সময়ে একটা বোমা গড়ের মাঠের ধারে,
মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গিয়ে ছিল একেবারে,
অনেক দিনের ঘটনা তাই ভুলে গেছ্‌ল লোকে,
মাটির ভেতর ছিল তাইতো দেখে নি কেউ চোখে,
অনেক বর্ষা'কেটে গেল, গেল অনেক মাস,
যুদ্ধ থামায় ফেলল লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস,
হঠাৎ সেদিন একলা রাতে গড়ের মাঠের ধারে,
বেড়িয়ে ফেরার সময় হঠাৎ চমকে উঠি : আরে !
বৃষ্টি পেয়ে জন্মেছে এক লম্বা বোমার গাছ,
তারই মাথায় দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোর নাচ,
গাছের ডালে ঝুলছে কেবল বোমা-ই সারি সারি,
তাই না দেখে ভড়কে গিয়ে ফিরে এলাম বাড়ি।
পরের দিনই সকাল বেলা গেলাম সে ময়দানে,
হায়রে !—গাছটি চুরি গেছে···কোথায় কে তা জানে।
গাছটা ছিল। গড়ের মাঠে খুঁজতে আজো ঘুরি,
প্রমাণ আছে অনেক, কেবল গাছটা গেছে চুরি ॥

জ্ঞানী

বরেনবাবু মস্ত জ্ঞানী, মস্ত বড় পাঠক,
পড়েন তিনি দিনরাত্তির গল্প এবং নাটক,
কবিতা আর উপন্যাসের বেজায় তিনি ভক্ত,
ডিটেকটিভের কাহিনীতে গরম করেন রক্ত ;
জানেন তিনি দর্শন আর নানা রকম বিজ্ঞান
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি, তাইতো আছে দিক্-জ্ঞান ;
ইতিহাস আর ভূগোলেতে বেজায় তিনি দক্ষ,—
এসব কথা ভাবলেই তাঁর ফুলতে থাকে বক্ষ।
সব সময়েই পড়েন তিনি, সকাল থেকে সন্ধ্যে,
ছুটির দিনে পড়েন তিনি, পড়েন পূজোর বন্ধে।
মাঝে মাঝে প্রকাশ করেন গূঢ় জ্ঞানের তত্ত্ব
বিদ্যাখানা জাহির করেন বরেন্দ্রনাথ দত্ত :
হঠাৎ ঢুকে রান্নাঘরে বলেন, এসব কী রে ?
ভাইঝি গীতা হেসে বলে, এসব কালো জিরে।
বরেনবাবু রেগে বলেন, জিরে তো হয় সাদা,
তিলও কালো, জিরেও কালো ?   পেয়েছিস কি গাধা ?
রান্না করার সময় কেবল পুড়িয়ে হাজার লঙ্কা,
হনুমতী হয়েছিস তুই, হচ্ছে আমার শঙ্কা।
হঠাৎ ছোট্ট খোকাটাকে কাঁদতে দেখে, দত্ত
খোলেন বিরাট বইয়ের পাতা নামটি "মনস্তত্ত্ব"।
খুঁজতে খুঁজতে বরেনবাবু হয়ে গেলেন সারা—
বুঝলেন না, কেন খোকা মাথায় করছে পাড়া।
হঠাৎ এসে ভাইঝি গীতা দুধের বাটি নিয়ে,
খাইয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিটে দিল ঘুম পাড়িয়ে।

বরেনবাবু ভাবেন, খোকার কেমনতর ধারা,
আধ ঘণ্টার চেঁচামেচি পাঁচ মিনিটেই সারা ?
বরেনবাবুর কাছে আরো বিরাট একটি ধাঁধা,
হলদে চালের রঙ কেন হয় ভাত হলে পর সাদা ?
পাথর বাটির গরম জিনিস ঠাণ্ডা হয় তা জানি,
পাহাড় দেশে গরম কেন এমন ছট্‌ফটানি ?
পথ চলতে ভেবে এসব ভিজে ওঠেন ঘামে,
মানিকতলা যেতে চাপেন ধর্মতলার ট্রামে।
বরেনবাবু জানেন কিন্তু নানা রকম বিজ্ঞান,
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি তাইতো এমন দিক্‌-জ্ঞান

মেয়েদের পদবী

মেয়েদের পদবীতে গোলমাল ভারী,
অনেকের নামে তাই দেখি বাড়াবাড়ি ;
'আ'কার অন্ত দিয়ে মহিলা করার
চেষ্টা হাসির। তাই ভূমিকা ছড়ার।
'গুপ্ত' 'গুপ্তা' হয় মেয়েদের নামে,
দেখেছি অনেক চিঠি, পোস্টকার্ড, খামে।
সে নিয়মে যদি আজ 'ঘোষ' হয় 'ঘোষা',
তা হলে অনেক মেয়ে করবেই গোসা,
'পালিত' 'পালিতা' হলে 'পাল' হলে 'পালা'
নির্ঘাৎ বাড়বেই মেয়েদের জ্বালা ;

'মল্লিক' 'মল্লিকা', 'দাস' হলে 'দাসা'
শোনাবে পদবীগুলো অতিশয় খাসা ;
'কর' যদি 'করা' হয়, 'ধর' হয় 'ধরা',
মেয়েরা দেখবে এই পৃথিবীটা—"সরা"।
'নাগ' যদি 'নাগা' হয়, 'সেন' হয় 'সেনা',
বড়ই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা ॥

বিয়ে বাড়ির মজা

বিয়ে বাড়ি : বাজছে সানাই, বাজছে নানান বাদ্য
একটি ধারে তৈরী হচ্ছে নানা রকম খাদ্য ;
হৈ-চৈ আর চেঁচামেচি, আসছে লুচির গন্ধ,
আলোয় আলোয় খুশি সবাই, কান্নাকাটি বন্ধ,
বাসরঘরে সাজছে ক'নে, সকলে উৎফুল্ল,
লোকজনকে আসতে দেখে কর্তার মুখ খুলল :
"আসুন আসুন,—বসুন সবাই, আজকে হলাম ধন্য,
যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য ;
মাংস, পোলাও, চপ-কাটলেট, লুচি এবং মিষ্টি
খাবার সময় এদের প্রতি দেবেন একটু দৃষ্টি।"
বর আসে নি, তাই সকলে ব্যস্ত এবং উৎসুক,
আনন্দে আজ বুক সকলের নাচছে কেবল ধুক্-ধুক্,
'হুলু' দিতে তৈরি সবাই, শাঁখ হাতে সব প্রস্তুত,
সময় চলে যাচ্ছে ব'লে মনটা করছে খুঁত-খুঁত।

মজুতদার :

দাঁড়াও তবে, বাড়ির ভেতর
একটু ঘুরে আসি,
চালের সঙ্গে ফাউও পাবে
ফুটবে মুখে হাসি।

মজুতদার :

এই নাও ভাই, চালকুমড়ো,
আমায় খাতির করো,
চালও পেলে কুমড়ো পেলে
লাভটা হল বড়॥

পুরনো ধাঁধা

বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?
বড়মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি-মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলামকুচি, একী অনাসৃষ্টি ?
বলতে পার ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে,
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে ?
ধনীর মেয়ের দামী পুতুল হরেক রকম খেলনা,
গরীব মেয়ে পায় না আদর, সবার কাছে ফ্যালনা।

বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য ?
'হিং-টিং-ছট্' প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায় ॥

ব্ল্যাক-মার্কেট

হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার,
ব্ল্যাক-মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার
গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান ছয় হাঁকালো।
কেউ নেই ত্রিভুবনে, নেই কিছু অভাবও
তবু ছাড়ল না তার লোক-মারা স্বভাব ও।
একা থাকে, তাই হরি চাকরটা রক্ষী
ত্রিসীমানা মাড়ায় না তাই কাক-পক্ষী।
বিশ্বে কাউকে রাম কাছে পেতে চান না,
হরিই বাজার করে, সে-ই করে রান্না।
এমনি ক'রেই বেশ কেটে যাচ্ছিল কাল,
হঠাৎ হিসেবে রাম দেখলেন গোলমাল,
বললেন চাকরকে : কিরে ব্যাটা, কি ব্যাপার ?
এত টাকা লাগে কেন বাজারেতে রোজকার ?
আলু তিন টাকা সের ? পটোল পনেরো আনা ?
ভেবেছিস বাজারের কিছু বুঝি নেই জানা ?

রোজ রোজ চুরি তোর ?   হতভাগা, বজ্জাত।
হাসছিস ?   এক্ষুনি ভেঙে দেব সব দাঁত।
খানিকটা চুপ ক'রে বলল চাকর হরি :
আপনারই দেখাদেখি ব্ল্যাক-মার্কেট করি ॥

ভাল খাবার

ধনপতি পাল, তিনি জমিদার মস্ত ;
সূর্য রাজ্যে তাঁর যায় নাকো অস্ত,
তার ওপর ফুলে উঠে কারখানা-ব্যাঙ্কে
আয়তনে হারালেন মোটা কালো ব্যাঙকে।
সবার "হুজুর" তিনি, সকলের কর্তা,
হাজার সেলাম পান দিনে গড়পড়তা।
সদাই পাহারা দেয় বাইরে সেপাই তাঁর,
কাজ নেই, তাই শুধু 'খাই-খাই' বাই তাঁর,
এটা খান, সেটা খান, সব লাগে বিদ্‌ঘুটে,
টান মেরে ফেলে দেন একটু খাবার খুঁটে ;
খাদ্যে অরুচি তাঁর, সব লাগে তিক্ত,
খাওয়া ফেলে ধমকান শেষে অতিরিক্ত।
দিনরাত চিৎকার : আরো বেশি টাকা চাই,
আরো কিছু তহবিলে জমা হয়ে থাকা চাই।
সব ভয়ে জড়োসড়ো, রোগ বড় প্যাঁচানো,
খাওয়া ফেলে দিনরাত টাকা ব'লে চ্যাঁচানো

ডাক্তার কবিরাজ ফিরে গেল বাড়িতে ;
চিন্তা পাকালো জট নায়েবের দাড়িতে।
নায়েব অনেক ভেবে বলে হুজুরের প্রতি :
কী খাদ্য চাই ? কী সে খেতে উত্তম অতি ?
নায়েবের অনুরোধে ধনপতি চারিদিক
দেখে নিয়ে বার কয় হাসলেন ফিক্-ফিক্ ;
তারপর বললেন : বলা ভারি শক্ত,
সব চেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত ॥

পৃথিবীর দিকে তাকাও

দেখ, এই মোটা লোকটাকে দেখ
অভাব জানে না লোকটা,
যা কিছু পায় সে আঁকড়িয়ে ধরে
লোভে জ্বলে তার চোখটা।
মাথা-উঁচু করা প্রাসাদের সারি
পাথরে তৈরি সব তার,
কত সুন্দর, পুরনো এগুলো !
অট্টালিকা এ লোকটার।
উঁচু মাথা তার আকাশ ছুঁয়েছে
চেয়ে দেখে না সে নীচুতে,
কত জমির যে মালিক লোকটা
বুঝবে না তুমি কিছুতে।

দেখ, চিমনীরা কী ধোঁয়া ছাড়ছে
কলে আর কারখানাতে,
মেশিনের কপিকলের শব্দ
শোনো, সবাইকে জানাতে।
মজুরেরা দ্রুত খেটেই চলেছে—
খেটে খেটে হল হন্যে ;
ধনদৌলত বাড়িয়ে তুলছে
মোটা প্রভুটির জন্যে।
দেখ, একজন মজুরকে দেখ
ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটছে,
কেনা গোলামের মতোই খাটুনি
তাই হাড়ভাঙা খাটছে।
ভাঙা ঘর তার নীচু ও আঁধার
স্যাঁতসেঁতে আর ভিজে তা,
এর সঙ্গে কি তুলনা করবে
প্রাসাদ বিশ্ব-বিজেতা ?
কুঁড়েঘরের মা সারাদিন খাটে
কাজ করে সারা বেলা এ,
পরের বাড়িতে ধোয়া মোছা কাজ—
বাকীটা পোষায় সেলায়ে।
তবুও ভাঁড়ার শূন্যই থাকে,
থাকে বাড়ন্ত ঘরে চাল,
বাচ্চা ছেলেরা উপবাস করে
এমনি ক'রেই কাটে কাল।

বাবু যত তারা মজুরকে তাড়া
করে চোখে চোখে রাখে,
ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে মজুরকে ধরে
দোকানে যাওয়ার ফাঁকে।
খাওয়ার সময় ভোঁ বাজলে তারা
ছুটে আসে পালে পাল,
খায় শুধু কড়কড়ে ভাত আর
হয়তো একটু ডাল।
কম-মজুরির দিন ঘুরে এলে
খাদ্য কিনতে গিয়ে
দেখে এ টাকায় কিছুই হয় না,
বসে গালে হাত দিয়ে।
পুরুত শেখায়, ভগবানই জেনো প্রভু
(সুতরাং চুপ ; কথা বলবে না কভু)
সকলেরই প্রভু—ভাল আর খারাপের
তাঁরই ইচ্ছায় এ ; চুপ করো সব ফের।
শিক্ষক বলে, শোনো সব এই দিকে,
চালাকি ক'রো না, ভাল কথা যাও শিখে।
এদের কথায় ভরসা হয় না তবু ?
সরে এসো তবে, দেখ সত্যি কে প্রভু।
ফ্যাকাশে শিশুরা, মুখে শাস্তির ভীতি,
আগের মতোই মেনে চলে সব নীতি।
যদি মজুরেরা কখনো লড়তে চায়,
পুলিশ প্রহারে জেলে টেনে নিয়ে যায়।

মজুরের শেষ লড়াইয়ের নেতা যত
এলোমেলো সব মিলায় ইতস্তত—
কারাপ্রাচীরের অন্ধকারের পাশে।
সেখানেও স্বাধীনতার বার্তা আসে।
রাশিয়াই, শুধু রাশিয়া মহান দেশ,
যেখানে হয়েছে গোলামির দিন শেষ ;
রাশিয়া, যেখানে মজুরের আজ জয়,
লেনিন গড়েছে রাশিয়া ! কী বিস্ময় !
রাশিয়া, যেখানে ন্যায়ের রাজ্য স্থায়ী,
নিষ্ঠুর 'জার' যেই দেশে ধরাশায়ী,
সোভিয়েট-'তারা' যেখানে দিচ্ছে আলো,
প্রিয়তম সেই মজুরের দেশ ভাল।
মজুরের দেশ, কল-কারখানা,
প্রাসাদ, নগর, গ্রাম,
মজুরের খাওয়া, মজুরের হাওয়া,
শুধু মজুরের নাম।
মজুরের ছুটি, বিশ্রাম আর
গরমে সাগর-ধার,
মজুরের কত স্বাধীনতা ! আর
অজস্র অধিকার।
মজুরের ছেলে ইস্কুলে যায়
জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে,
ছোট ছোট মন ভরে নেয় শুধু
জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে।

মজুরের সেনা 'লাল ফৌজ' দেয়
পাহারা দিন ও রাত,
গরীবের দেশে সইবে না তারা
বড়লোকদের হাত।
শান্ত-স্নিগ্ধ, বিবাদ-বিহীন
জীবন সেখানে, তাই
সকলেই সুখে বাস করে আর
সকলেই ভাই-ভাই ;
এক মনেপ্রাণে কাজ করে তারা
বাঁচাতে মাতৃভূমি,
তোমার জন্যে আমি, সেই দেশে,
আমার জন্যে তুমি ॥

সিপাহী বিদ্রোহ

হঠাৎ দেশে উঠল আওয়াজ—"হো-হো, হো-হো, হো-হো"
চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে—সিপাহী বিদ্রোহ !
আগুন হয়ে সারাটা দেশ ফেটে পড়ল রাগে,
ছেলে বুড়ো জেগে উঠল নব্বই সন আগে ;
একশো বছর গোলামিতে সদাই তখন ক্ষিপ্ত,
বিদেশীদের রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত !
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী—
সবার হাতে অস্ত্র, নাচে বনের পশু-পক্ষী।

কেবল ধনী, জমিদার, আর আগের রাজার ভক্ত
যোগ দিল, তা নয়কো, দিল গরীবেরাও রক্ত!
সবাই জীবন তুচ্ছ করে, মুসলমান ও হিন্দু,
সবাই দিতে রাজি তাদের প্রতি রক্তবিন্দু;
ইতিহাসের পাতায় তোমরা পড় কেবল মিথ্যে,
বিদেশীরা ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে।
অত্যাচারী নয়কো তারা, অত্যাচারীর মুণ্ড
চেয়েছিল ফেলতে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড।
নানা জাতের নানান সেপাই গরীব এবং মূর্খ:
সবাই তারা বুঝেছিল অধীনতার দুঃখ;
তাইতো তারা স্বাধীনতার প্রথম লড়াই লড়তে
এগিয়েছিল, এগিয়েছিল মরণ বরণ করতে!

আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা;
উঠছে বেজে কোনোদিকেই নেইকো কোনো শঙ্কা;
জব্বলপুরে সেপাইদেরও উঠছে বেজে বাদ্য
নতুন ক'রে বিদ্রোহ আজ; কেউ নয়কো বাধ্য,
তখন এঁদের স্মরণ করো, স্মরণ করো নিত্য—
এঁদের নামে, এঁদের পণে শানিয়ে তোলো চিত্ত।
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী,
এঁদের নামে, দৃপ্ত কিশোর, খুলবে তোমার চোখ কি?

আজব লড়াই

ফেব্রারী মাসে ভাই, কলকাতা শহরে
ঘটল ঘটনা এক, লম্বা সে বহরে!
লড়াই লড়াই খেলা শুরু হল আমাদের,
কেউ রইল না ঘরে রামাদের শ্যামাদের ;
রাস্তার কোণে কোণে জড়ো হল সকলে,
তফাৎ রইল নাকো আসলে ও নকলে,
শুধু শুনি 'ধর' 'ধর' 'মার' 'মার' শব্দ
যেন খাঁটি যুদ্ধ এ, মিলিটারী জব্দ।
বড়রা কাঁদুনে গ্যাসে কাঁদে, চোখ ছল ছল
হাসে ছিঁচকাঁদুনেরা বলে, 'সব ঢাল জল'।
ঐ বুঝি ওরা সব সঙ্গীন উঁচোলো,
ভয় নেই, যত হোক বেয়নেট ছুঁচোলো,
ইঁট-পাটকেল দেখি রাখে এরা তৈরি,
এইবার যাবে কোথা, বাছাধন বৈরী!
ভাবো বুঝি ছোট ছেলে, একেবারে বাচ্চা!
এদের হাতেই পাবে শিক্ষাটা আচ্ছা ;
ঢিল খাও, তাড়া খাও, পেট ভরে কলা খাও,
গালাগালি খাও আর খাও কানমলা খাও।
জালে ঢাকা গাড়ি চড়ে বীরত্ব কি যে এর
বুঝবে কে, হরদম সামলায় নিজেদের।
বার্মা-পালানো সব বীর এরা বঙ্গে
যুদ্ধ করছে ছোট ছেলেদের সঙ্গে ;
ঢিলের ভয়েতে ওরা চালায় মেসিনগান,
"বিশ্ববিজয়ী" তাই রাখে জান, বাঁচে মান।

খালি হাত ছেলেদের তেড়ে গিয়ে করে খুন ;
সাবাস ! সাবাস ! ওরা খেয়েছে রাজার নুন ।

ডাংগুলি খেলা নয়, গুলির সঙ্গে খেলা,
রক্ত-রাঙানো পথে ছু পাশে ছেলের মেলা ;
ছুর্দম খেলা চলে, নিষেধে কে কান দেয় ?
ও-বাড়ি ও ও-পাড়ার কালো, ছোটু প্রাণ দেয় ।
স্বচক্ষে দেখলাম বস্তির আলী জান,
'আংরেজ চলা যাও' বলে ভাই দিল প্রাণ ।

এমন বিরাট খেলা শেষ হল চটপট
বড়দের বোকামিতে আজো প্রাণ ছটফট ;
এইবারে আমি ভাই হেরে গেছি খেলাতে,
ফিরে গেছি দাদাদের বকুনির ঠেলাতে ;
পরের বারেতে ভাই শুনব না কারো মানা,
দেবই, দেবই আমি নিজের জীবনখানা ॥

অভিযান

সমগ্র-১৩

নেপথ্যে (গান)

ক্ষুধিতের সেবার সব ভার
লও লও কাঁধে তুলে—
কোটি শিশু নরনারী
মরে অসহায় অনাদরে,
মহাশ্মশানে জাগো মহামানব
আগুয়ান হও ভেদ ভুলে।

বৈজয়ন্তী নগর। সকাল। (দূরে কে যেন বলছে)

হে পুরবাসী! হে মহাপ্রাণ,
যা কিছু আছে করগো দান,
অন্ধকারের হোক অবসান
করুণা-অরুণোদয়ে।

বালকদলের প্রবেশ

উদয়ন

ওই ছাখ, ওই ছাখ, আসে ওই
আয় তোরা, ওর সাথে কথা কই।

ইন্দ্রসেন

নগরে এসেছে এক অদ্ভুত মেয়ে
পরের জন্যে শুধু মরে ভিখ্ চেয়ে।

সত্যকাম

শুনেছি ও থাকে দূর দেশে,
সেইখান থেকে হেঁটে এসে

দেশের জন্যে ভিখ্ চায়
আমাদের খোলা দরজায়।

উদয়ন

শুনেছি ওদের দেশে পথের ধারে
মরছে হাজার লোক বিনা আহারে,
নানান ব্যাধিতে দেশ গিয়েছে ছেয়ে,
তাইতো ভিক্ষা মাগে ওদের মেয়ে।

সংকলিতার প্রবেশ (গান ধরল)

গান

শোনো, শোনো, ও বিদেশের ভাই,
এসেছি আজ বন্ধুজনের ঠাঁই ;
দেশবাসী মরছে অনশনে
তোমরা কিছু দাও গো জনে জনে,
বাঁচাব দেশ অন্ন যদি পাই।

উদয়ন

শোনো ওগো বিদেশের কন্যা,
ব্যাধি দুর্ভিক্ষের বন্যা
আমরাই প্রাণ দিয়ে বাঁধব—
তোমাদের কান্নায় আমরাও যোগ দিয়ে কাঁদব।

ইন্দ্রসেন

আমরা তোমায় তুলে দেব অন্ন বস্ত্র অর্থ
তুমি কেবল গান শোনাবে এই আমাদের শর্ত।

সত্যকাম

ওই ছাখ আসে হেথা রাজ্যের কোতোয়াল
ইয়া বড় গোঁফ তার, হাতে বাঁকা তরোয়াল ;
ওর কাছে গিয়ে তুমি পাতো দুই হস্ত
ও দেবে অনেক কিছু, ও যে লোক মস্ত !

কোতোয়ালের প্রবেশ

সংকলিতা (আঁচল তুলে)

ওগো রাজপ্রতিনিধি,
তুমি রাজ্যের বিধি।
তুমি দাও আমাদের অন্ন,
আমরা যে বড়ই বিপন্ন।

কোতোয়াল

যা চ'লে ভিখারী মেয়ে যা চ'লে
দেব না কিছুই তোর আঁচলে।

সংকলিতা

তুমি যদি না দেবে তো কে দেবে এ রাজ্যে ?
সবারে রক্ষা করা তোমাদের কাজ যে।

কোতোয়াল

চুপ কর হতভাগী, বড় যে সাহস তোর ?
এখুনি বুঝিয়ে দেব আমার গায়ের জোর।

সংকলিতা

তোমরা দেখাও শুধু শক্তি,
তাইতো করে না কেউ ভক্তি ;
করো না প্রজার কোনো কল্যাণ,
তোমরা অন্ধ আর অজ্ঞান।

কোতোয়াল

চল তবে মুখপুড়ী, বেড়েছিস বড় বাড়—
কপালে আছে রে তোর নির্ঘাত কারাগার।

(সংকলিতাকে পাকড়াও করে গমনোদ্যত, এমন সময় জনৈক পথিকের প্রবেশ)

পথিক

শুনেছ হে কোতোয়াল—
নগরে শুনছি যেন গোলমাল ?

উদয়, ইন্দ্র ও সত্য (একসঙ্গে)
ছাড়, ছাড়, ছাড় ওকে—ছেড়ে দাও।

কোতোয়াল

ওরে রে ছেলের দল, চোপরাও !

সংকলিতা

কখনো কি তোমরা ন্যায়ের ধারটি ধারো ?
বন্দী যদি করো আমায় করতে পারো ;

করি নি তো দেশের আঁধার ঘুচিয়ে আলো
কারাগারে যাওয়াই আমার পক্ষে ভালো।'

পথিক

ওগো নগরপাল!
রাজপুরীতে এদিকে যে জমলো প্রজার পাল।

পথিকের প্রস্থান

ইন্দ্রসেন

অত্যাচারী কোতোয়ালের আজকে একি অত্যাচার?
এমনিতর খেয়ালখুশি করব না বরদাস্ত আর।

কোতোয়াল
(তরবারি উঁচিয়ে)

হারে রে দুধের ছেলে, এতটুকু নেই ডর?
মাথার বিয়োগব্যথা এখুনি বুঝবে ধড়।

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত
(চিৎকার ক'রে)

রাখো অস্ত্রের চাকচিক্য
এদেশে লেগেছে দুর্ভিক্ষ
প্রজাদল হয়েছে অশান্ত
মহারাজ তাই বিভ্রান্ত।

কোতোয়াল

একি শুনি আজ তোমার ভাষ্য ?
মনে হয় যেন অবিশ্বাস্য,
মহামন্বন্তরের হাস্য,
এখানেও শেষে হল প্রকাশ্য ?

উদয়ন

আমরা তো পূর্বেই জানি,
লাঞ্ছিতা হলে কল্যাণী
এদেশেও ঘটবে অমঙ্গল
উঠবেই মৃত্যুর কল্লোল।

কোতোয়াল

বুঝলাম, সামান্যা নয় এই মেয়ে,
নৃপতিকে সংবাদ দাও দূত যেয়ে।

রাজদূতের প্রস্থান

(সংকলিতার প্রতি)

আজকে তোমার প্রতি করেছি যে অন্যায়
তাইতো ডুবছে দেশ মৃত্যুর বন্যায় ;
বলো তবে দয়া করে কিসে পাব উদ্ধার
ঘুচবে কিসের ফলে মৃত্যুর হাহাকার ?

সংকলিতা

নই আমি অদ্ভুত, নই অসামান্যা,
ধ্বনিত আমার মাঝে মানুষের কান্না—

যেখানে মানুষ আর যেখানে তিতিক্ষা
আমার দেশের তরে সেথা চাই ভিক্ষা।
আমার দেশের সেই মহামন্বন্তর
ঘিরেছে তোমার দেশও ধীরে অভ্যন্তর।

মহারাজ ও পিছনে কুবের শেঠের প্রবেশ

মহারাজ

কে তুমি এসেছ মেয়ে আমাব দেশে,
এসেছ কিসের তরে, কার উদ্দেশে ?

সংকলিতা

আমার দেশেতে আজ মরে লোক অনাহারে,
এসেছি তাদের তরে মহামানবের দ্বারে—
লাখে লাখে তারা আজ পথের দুধার থেকে
মৃত্যুদলিত শবে পথকে ফেলেছে ঢেকে।
চাষী ভুলে গেছে চাষ, মা তার ভুলেছে স্নেহ,
কুটিরে কুটিরে জমে গলিত মৃতের দেহ ;
উজাড় নগর গ্রাম, কোথাও জ্বলে না বাতি,
হাজার শিশুরা মরে, দেশের আগামী জাতি।
রোগের প্রাসাদ ওঠে সেখানে প্রতিটি ঘরে,
মানুষ ক্ষুধিত আর শেয়ালে উদর ভরে ;
এখনো রয়েছে কোটি মরণের পথ চেয়ে
তাইতো ভিক্ষা মাগি এদেশে এ-গান গেয়ে—

গান

ওঠো জাগো ও দেশবাসী,
আমরা যে রই উপবাসী,
আসছে মরণ সর্বনাশী।
হও তবে সত্বর—
দুয়ারে উঠল মহাঝড়।

সংকলিতা

কিন্তু তোমার এই এতবড় রাজ্য
এখানে পেলাম নাকো কোনোই সাহায্য।

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত

প্রজারা সহসা ক্ষিপ্ত হয়েছে যে মহারাজ—
রাজপ্রাসাদের পাসে ভিড় করে আছে আজ।

প্রস্থান

মহারাজ

বলো মেয়ে তাদের আমি শান্ত করি কী দিয়ে ?

সংকলিতা

ধনাগার আজ তাদের হাতে এখুনি দাও ফিরিয়ে।

মহারাজ

তাও কখনো সম্ভব ?
অবশেষে ছাড়ব বিপুল বৈভব ?

কুবের শেঠ
(করজোড়ে)

শ্রীচরণে নিবেদন করি সবিনয়—
কখনই নয়, প্রভু, কখনই নয়।

মহারাজ

কিন্তু কুবের শেঠ,
বড়ই উতলা দেখি এদের ক্ষুধিত পেট।

কুবের শেঠ

এ এদের ছল, মহারাজ !
নতুবা নির্ঘাত দুষ্ট চাষীদের কাজ !

মহারাজ

তুমিই যখন এদের সমস্ত,
এদের খাওয়ার সকল বন্দোবস্ত
তোমার হাতেই করলাম আজ ন্যস্ত।

কুবের শেঠ
(বিগলিত হয়ে)

মহারাজ ন্যায়পরায়ণ !
তাইতো সদাই সেবা করি ও চরণ !

মহারাজের সঙ্গে শেঠের প্রস্থান

ইন্দ্রসেন

বাঘের ওপর দেওয়া হল ছাগ পালনের ভার,
কোতোয়াল হে ! তোমাদের যে ব্যাপার চমৎকার !

কোতোয়াল

বটে ! বটে ! বড় যে সাহস ?
গর্দান যাবে তবে রোস্ !

সংকলিতা

ছেলের দলের সামনে সাহস ভারি,
যোগ্য লোকের কাছে গিয়ে ঘোরাও তরবারি।

কোতোয়াল

চুপ করে থাক্ মেয়ে, চুপ করে থাক্,
তুই এনেছিস্ দেশে ভীষণ বিপাক।
যেদিন এদেশে তুই এলি ভিখারিনী
অশুভ তোরই সাথে এল সেই দিনই

সত্যকাম

কে বলে একথা কোতোয়াল ?
ও হেথা এসেছে বহুকাল ;
এতদিন ছিল না আকাল।

প্রজার ফসল করে হরণ
তুমিই ডেকেছ দেশে মরণ,
সে কথা হয় না কেন স্মরণ ?
জমানো তোমার ঘরে শস্য,
তবু তুমি করো ওকে দৃষ্য ?

কোতোয়াল

কে হে তুমি ? দেখছি চোরের পকেটকাটা সাক্ষী,
বলছ কেবল বৃহৎ বৃহৎ বাক্যি ?

ইন্দ্রসেন

কোতোয়ালজী, আজকে হঠাৎ রাগের কেন বৃদ্ধি ?
তোমার কি আজ খাওয়া হয় নি সিদ্ধি ?

কোতোয়াল

চুপ কর ওরে হতভাগা !
এটা নয় তামাসার জা'গা !

(দাঁতে দাঁত ঘ'সে সংকলিতার প্রতি)

এই মেয়ে বাড়িয়েছে ছেলেদের বিক্রম,
তাইতো আমাকে কেউ করে নাকো সম্ভ্রম।

সংকলিতা

চিরদিনই তরুণেরা অন্যায়ের করে নিবারণ,
এদের এ সাহসের আমি তাই নয়কো কারণ।

কোতোয়াল

আমি রামদাস কোতোয়াল—
চটাস্‌নি ভুলে, আর কাটিস্‌নি কুমিরের খাল।

সংকলিতা

ছি! ছি! ছি! ওগো কোতোয়ালজী,
আমি কি তোমাকে পারি চটাতে?
শত্রুও পারে না তা রটাতে।

কোতোয়াল

জানে বাতাস, জানে অন্তরীক্ষ,
জানে নদী, জানে বনের বৃক্ষ,
তুই এনেচিস এদেশে দুর্ভিক্ষ।

সংকলিতা

ক্ষমা করো! আমি সর্বনেশে!
পরের উপকারের তরে এসে—
মন্বন্তর ছড়িয়ে গেলাম তোমাদের এই দেশে

উদয়ন

অমন ক'রে বলছ কেন
জ্বালছ মনে কেন ক্ষোভের অগ্নি?
রাঘব বোয়াল এই কোতোয়াল
হানা দেয় এ রাজ্যে
একে তুমি এনোই না গেরাহ্যে।

কোতোয়াল

আমার শাসন-ছায়ায় হয়ে পুষ্ট
রাঘব বোয়াল বলিস আমায় দুষ্ট ?

ইন্দ্রসেন

বলা উচিত সহস্রবার যেমন তুমি নির্দয়।
নির্দোষকে পীড়ন করায় যেমন তোমার নেই ভয়।

কোতোয়াল

বার বার করেছি তো সাবধান,
এইবার যাবে তোর গর্দান।

সংকলিতা

চুপ করে থাক ভাই, কথায় নেইকো ফল,
আমার জন্যে কেন ডাকছ অমঙ্গল ?
রাজা ধনাগার যদি দেন প্রজাদের হাতে
ওর যে সমূহ ক্ষতি, ভেবে ও ক্ষুব্ধ তাতে।

কোতোয়াল

ওরে ওরে রাক্ষুসী, ওরে ওরে ডাইনী,
তোর কথা আমি যেন শুনতেই পাই নি,
তোর যে ঘনাল দিন, সাহস ভয়ংকর,
দুঃসাহসের কথা বলতে নেইকো ডর ?

সত্যকাম

তোমার মতো দুর্জনকে করতে হলে ভয়
পৃথিবীতে বেঁচে থাকা মোটেই উচিত নয়।

কোতোয়াল

তোদের মুখে শুনছি যেন ভাগবতের টীকা,
নিজের হাতে জ্বালছিস আজ নিজের চিতার শিখা।

ইন্দ্রসেন

একটি তোমার তলোয়ারের জোরে
ভাবছ বুঝি চিরকালটাই যাবে শাসন করে ?
সেদিন তো আজ অনেক কালই গত,
তোমার মুখের ফাঁকা আওয়াজ শুনছি অবিরত।

কোতোয়াল

(ইন্দ্রসেনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে)

বুঝলে এঁচোড়পাকা,
আওয়াজ আমার নয়কো মোটেই ফাঁকা।

সংকলিতা

(আর্তনাদ ক'রে)

দরিদ্রের রক্ত ক'রে শোষণ
বিরাট অহংকারকে করো পোষণ,
তুমি পশু, পাষণ্ড, বর্বর
অত্যাচারী, তোমার ও হাত কাঁপে না থরথর !

কোতোয়াল

(হুংকার দিয়ে)

আমাকে বলিস পশু, বর্বর ?
ওরে দুর্মতি তুই তবে মর !

(তলোয়ারের আঘাতে আর্তনাদ ক'রে সংকলিতার মৃত্যু)

প্রজাদলের প্রবেশ ও কোতোয়াল পলায়নোদ্যত

জনৈক পথিক

কোথায় সে কন্যা, অপরূপ কান্তি,
যার বাণী আমাদের দিতে পারে শান্তি ;
দেশে আজ জাগরণ যার সংগীতে,
আমরা যে উৎসুক তাকে গৃহে নিতে।

(সংকলিতার মৃতদেহের দিকে চেয়ে আর্তনাদ ক'রে)

এ যে মহামহীয়সী, এ যে কল্যাণী
ধূলায় লুটায় কেন এর দেহখানি ?

ইন্দ্রসেন

(কোতোয়ালকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে)

ওই দেখ, ভাই সব, ওই অপরাধী
সবার বিচার হোক ওর প্রতিবাদী—

জনৈক প্রজা

ওরে রে স্পর্ধিত পশু, কী সাহস তোর
তুই করেছিস আজ অন্যায় ঘোর ;
কল্যাণীকে হেনে আজ তোর আর
পৃথিবীতে বাঁচবার নেই অধিকার।

ইন্দ্রসেন

রাজার ওপরে আর করব না নির্ভর—
আমাদের ভাগ্যের আমরাই ঈশ্বর।

সকলে

চলবে না অন্যায়, খাটবে না ফন্দি,
আমাদের আদালতে আজ তুই বন্দী !!!

(কোতোয়ালকে প্রজারা বন্দী করল)

যবনিকা

সূর্য-প্রণাম

উদয়াচল

আগমনী

সমবেত গান

পুব সাগরের পার হতে কোন পথিক তুমি উঠলে হেসে,
তিমির ভেদি ভুবন-মোহন আলোর বেশে।
ওগো পথিক, তোমার আলোয় ঘুচুক জরা
ছন্দে নাচুক বসুন্ধরা।
গগনপথে যাত্রা তোমার নিরুদ্দেশে।
তুমি চিরদিনের দোলে দোলাও অনন্ত আবর্তনে,
নৃত্যে কাঁপুক চিত্ত মোদের নটরাজের নর্তনে।
আলোর সুরে বাজাও বাঁশি,
চিরকালের রূপ-বিকাশি,
আঁধার নাশে সুন্দর হে তোমার বাণীর মূক আবেশে॥

আবির্ভাব

আবৃত্তি

সূর্যদেব,
আজি এই বৈশাখের খরতপ্ত তেজে
পৃথিবী উন্মত্ত যবে তুমি এলে সেজে

কনক-উদয়াচলে প্রথম আবেগে
ফেলিলে চরণচিহ্ন, তার স্পর্শ লেগে
ধরণী উঠিল কাঁপি গোপন স্পন্দনে
সাজাল আপন দেহ পুষ্প ও চন্দনে
তব পূজা লাগি। পৃথিবীর চক্ষুদান
হল সেই দিন। অন্ধকার অবসান,
যবে দ্বার খুলে প্রভাতের তীরে আসি
বলিলে, হে বিশ্বলোক তোরে ভালবাসি,
তখনি ধরিত্রী তার জয়মাল্যখানি
আশীর্বাদসহ তব শিরে দিল আনি—
সস্মিত নয়নে। তারে তুমি বলেছিলে,
জানি এ যে জয়মাল্য, মোরে কেন দিলে ?
কতবার তব কানে পঁচিশে বৈশাখ
সুদূরের তরে শুধু দিয়ে গেল ডাক,
তুমি বলেছিলে চেয়ে সম্মুখের পানে
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

বরণ

বর্ণনা

হঠাৎ আলোর আভাস পেয়ে কেঁপে উঠল
ভোরবেলা, কোন্ পুলকে, কোন্ অজানা সম্ভাবনায় ?
রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করে অন্ধকার।

শিউলি বকুল ঝ'রে পড়ে শেষ রাত্রির কান্নার মতো,
হেমন্ত-ভোরের শিশিরের মতো।
অস্পষ্ট হল অন্ধকার ; স্বচ্ছ, আরও স্বচ্ছ
মৃতপ্রায়ের আগ্রহের মতো পাণ্ডুর আলো এসে পড়ে
আশীর্বাদের মতো ঝরা ফুলের মরা চোখে,
শুভ্র কপোলে,—ঘুমন্ত হাসির মতো তার মায়া।
পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা এল উচ্ছ্বসিত বন্যার বেগে,
হাতে তাদের আহরণী-ডালা ;
তারা অবাক হয়ে দেখলে
একী! নতুন ফুল ফুটেছে তাদের আঙিনায়
রবির প্রথম আলো এসে পড়েছে তার মুখে,
ওরা বললে, ওতো সূর্যমুখী।
পিলু-বারোয়াঁর সুর তখনও রজনীগন্ধার বনে
দীর্ঘশ্বাসের মতো সুরভিত-মত্ততায় হা-হা করছে ;
কিন্তু তাও গেল মিলিয়ে। শুধু জাগিয়ে দিয়ে
গেল হাজার সূর্যমুখীকে।
সূর্য উঠল। অচেতন জড়তার বুকে ঠিকরে
পড়তে লাগল, বন্ধ জানলায় তার কোমল
আঘাত, অজস্র দীপ্তিতে বিহ্বল।
পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা ফিরে গেল উজ্জ্বল, উচ্ছল হয়ে
বুকে তাদের সূর্যমুখীর
অদৃশ্য সুবাস।

মঙ্গলাচরণ

গান

ওগো কবি, তুমি আপন ভোলা—
আনিলে তুমি নিথর জলে ঢেউয়ের দোলা,
মালিকাটি নিয়ে মোর
একী বাঁধিলে অলখ-ডোর।
নিবেদিত প্রাণে গোপনে তোমার কি সুর তোলা,
জেনেছ তো তুমি সকল প্রাণের নীরব কথা,
তোমার বাণীতে আমার মনের এ ব্যাকুলতা
পেয়েছ কি তুমি সাঁঝের বেলাতে
যখন ছিলাম কাজের খেলাতে
তখন কি তুমি এসেছিলে, ছিল যে দুয়ার খোলা ?

আহ্বান

সমবেত গান

আমাদের ডাক এসেছে
এবার পথে চলতে হবে,
ডাক দিয়েছে গগন-রবি
ঘরের কোণে কেই বা রবে।
ডাক এসেছে চলতে হবে আজ সকালে
বিশ্বপথে সবার সাথে সমান তালে
পথের সাথী আমরা রবির

সাঁঝ-সকালে চলরে সবে।
ঘুম থেকে আজ সকালবেলা ওঠ রে
ডাক দিল কে পথের পানে ছোট রে,
পিছন পানে তাকাস নি আজ চল সমুখে
জয়ের বাণী নূতন প্রাতে বল ও-মুখে
তোদের চোখে সোনার আলো
সফল হয়ে ফুটবে কবে।

স্তব

আবৃত্তি

কবিগুরু, আজ মধ্যাহ্নের অর্ঘ্য
দিলাম তোমায় সাজায়ে,
পৃথিবীর বুকে রচেছ শান্তিস্বর্গ
মিলনের সুর বাজায়ে।
যুগে যুগে যত আলোক-তীর্থযাত্রী
মিলিবে এখানে আসিয়া,
তোমার স্বর্গ এনে দেবে মধুরাত্রি
তাহাদের ভালবাসিয়া।
তারা দেবে নিতি শান্তির জয়মাল্য
তোমার কণ্ঠে পরায়ে,
তোমার বাণী যে তাহাদের প্রতিপাল্য,
মর্মেতে যাবে জড়ায়ে।

তুমি যে বিরাট দেবতা শাপভ্রষ্ট
ভুলিয়া এসেছ মর্তে
পৃথিবীর বিষ পান করে নাই এখনো তোমার ওষ্ঠ
ঝঞ্ঝা-প্রলয়-আবর্তে ।
আজিকার এই ধূলিময় মহাবাসরে
তোমারে জানাই প্রণতি,
তোমার পূজা কি শঙ্খঘণ্টা কাঁসরে ?
ধূপ-দীপে তব আরতি ?
বিশ্বের আজ শান্তিতে অনাসক্তি,
সভ্য মানুষ যোদ্ধা,
চলেছে যখন বিপুল রক্তারক্তি,
তোমারে জানাই শ্রদ্ধা ।

●

অবশেষ

বর্ণনা

কিন্তু মধ্যাহ্ন তো পেরিয়ে যায়
সন্ধ্যার সন্ধানে, মেঘের ছায়ায়
বিশ্রাম করতে করতে, আকাশের
সেই ধূ-ধূ করা তেপান্তরের মাঠ ।
আর সূর্যও তার অবিরাম আলোক-সম্পাত
ক'রে ঢলে পড়ল সাঁঝ-গগনে ।
সময়ের পশ্চাতে বাঁধা সূর্যের গতি
কী সূর্যের পিছনে বাঁধা সময়ের গতি

তা বোঝা যায় না।
দিন যায় ভাবীকালকে আহ্বান করতে।
একটা দিন আর একটা ঢেউ,
সময় আর সমুদ্র।
তবু দিন যায়
সূর্যের পিছনে, অন্ধকারে অবগাহন
করতে করতে।

যেতে হবে।
প্রকৃতির কাছে এই পরাভবের লজ্জায়
আর বেদনায় রক্তিম হল
সূর্যের মুখ,
আর পৃথিবীর লোকেরা ;
তাদের মুখ পূব-আকাশের মতো
কালো হয়ে উঠল।

মিনতি

সমবেত গান

দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে,
যেও না চলে,
অরুণ-আলো কে যে দেবে
যাও গো বলে।

ফেরো তুমি যাবার বেলা ;
সাঁঝ-আকাশে রঙের মেলা—
দেখছ কী কেমন ক'রে
আগুন হয়ে উঠল জ্বলে।
পূব-গগনের পানে বারেক তাকাও
বিরহেরই ছবি কেন আঁকাও
আঁধার যেন দৈত্য সম আসছে বেগে,
শেষ হয়ে যাক তারা তোমার ছোঁয়াচ লেগে
থামো ওগো, যেও না হয়
সময় হলে ॥

সূর্য-প্রণাম

অস্তাচল

প্রান্তিক

আবৃত্তি

বেলাশেষে শান্তছায়া সন্ধ্যার আভাসে
বিষণ্ণ মলিন হয়ে আসে,
তারি মাঝে বিভ্রান্ত পথিক
তৃপ্তিহীন খুঁজে ফেরে পশ্চিমের দিক।
পথপ্রান্তে
প্রাচীন কদম্বতরুমূলে,
ক্ষণতরে স্তব্ধ হয়ে যাত্রা যায় ভুলে।
আবার মলিন হাসি হেসে
চলে নিরুদ্দেশে।
রজনীর অন্ধকারে একটি মলিন দীপ হাতে
কাদের সন্ধান করে উষ্ণ অশ্রুপাতে
কালের সমাধিতলে।
স্মৃতিরে সঞ্চয় করে জীবন-অঞ্চলে ;
মাঝে মাঝে চেয়ে রয় ব্যথা ভরা পশ্চিমের দিকে,
নির্নিমিখে।
যেথায় পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে অমর অক্ষরে
সেথায় কাদের আর্তনাদ বারংবার বৈশাখীর ঝড়ে
আবার সম্মুখপানে
যাত্রা করে রাত্রির আহ্বানে।

ক্ষণদীপ উর্বর আলোতে
চিরন্তন পথের সংকেত
রেখে যায় প্রভাতের কানে।
অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃতির অন্তঃপুরে,
ভেসে ওঠে মানসমুকুরে
উত্তরকালের আর্তনাদ,—
"কবিগুরু
আমাদের যাত্রা শুরু
কালের অরণ্য পথে পথে
পরিত্যক্ত তব রাজ-রথে
আজি হতে শতবর্ষ আগে
অস্ত গোধূলির সন্ধ্যারাগে
যে দিগন্ত হয়েছে রক্তিম,
সেথা আজ কারো চিত্তবীণা
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজে কিনা
সে কথা শুধাও ?
শুধু দিয়ে যাও
ক্ষণিকের দক্ষিণ বাতাসে তোমার সুবাস
বাণীহীন অন্তরের অন্তিম আভাস।
তাই আজ বাধামুক্ত হিয়া
অজস্র উপেক্ষাভরে বিস্মৃতিরে পশ্চাতে ফেলিয়া
ছিন্নবাধা বলাকার মতো
মত্ত অবিরত,
পশ্চাতের প্রভাতের পুষ্প-কুঞ্জবনে
আজ শূন্য মনে।"

তাই উচ্চকিত পথিকের মন
অকারণ
উচ্ছলিত চঞ্চল পবনে
অনাগত গগনে গগনে।
ক্লান্ত আজ প্রভাতের উৎসবের বাঁশি ;
পুরবাসী নবীন প্রভাতে
পুরাতন জয়মাল্য হাতে !
অস্তাচলে পথিকের মুখে মূর্ত হাসি॥

শেষ মিনতি

গান

ও কে যায় চলে কথা না বলে, দিও না যেতে
তাহারই তরে আসন ঘরে রেখেছি পেতে।
কত কথা আজ তার মনেতে সদাই,
তবু কেন রবি কহে আমি চলে যাই ;
রামধনু রথে
বিদায়ের পথে
উঠিল মেতে।
রঙে রঙে আজ গোধূলি গগন
রঙিন কী হল, বিলাপে মগন।
আমি কেঁদে কই যেও না কোথাও,
সে যে হেসে কয় মোরে যেতে দাও

বাড়ায়ে বাহু
মরণ-রাহু
চাহিছে পেতে ॥

আয়োজন

বর্ণনা

হঠাৎ বুঝি তোমার রথের সাতটি ঘোড়া উঠল
হ্রেষা-রবে চঞ্চল হয়ে, যাবার ডাক শুনি ?
অস্তপথ আজ তোমারই প্রত্যাশায় উন্মুখ, হে কবি,
কখন তুমি আসবে ?
কবে, কখন তুমি এসে দাঁড়ালে
অস্তপথের সীমানায়, কেউ জানল না ; এমন কী
তুমিও না।
একবার ভেবে দেখেছ কি,
হে ভাবুক, তোমার চলমান ঘোড়ার শেষ পদক্ষেপের
আঘাতে কেমন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠবে আমাদের
অন্তরলোক ?
তোমার-রচিত বাণীর মন্দিরে কোন্
নতুন পূজারী আসবে জানি না, তবু তোমার আসন হবে
শূন্য আর তোমার নিত্য-নূতন পূজাপদ্ধতি, অর্ঘ্য-উপচার
আর মন্দিরের বেদী স্পর্শ করবে না। দেউলের ফাটল
দিয়ে কোন অশত্থ-তরু চাইবে আকাশ, চাইবে তোমার

মন্দিরে তার প্রতিষ্ঠা, জানি না। তবু একদিন তা
সম্ভব, তুমিও জানো। সেই দিনকার কথা
ভেবে দেখেছ কি, হে দিগন্ত-রবি ?
তোমার বেণুতে আজ শেষ সুর কেঁপে উঠল।
তুমি যাবে আমাদের মথিত করে। কোন্ মহাদেশের
কোন্ আসনে হবে তোমার স্থান ? বিশ্ববীণার তারে আজ
কোন্ সুর বেজে উঠেছে, জানো ? সে তোমারই বিদায়
বেদনায় সকরুণ ওপারের সুর। এই সুরই চিরন্তন,
সত্য এবং শাশ্বত। যুগের পর যুগ যে সুর ধ্বনিত হয়ে
আসছে আবহমানকালের সেই সুর। সৃষ্টি-সুরের
প্রত্যুত্তর এই সুরের নাম লয়। তান-লয় নিতে তোমার
খেলা চলেছে কতকাল, আজ সেই লয়ের তান রণরণিত হচ্ছে
কোন্ অদৃশ্য তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, জানি না।
কোন্ যুগান্তরের পারেও ধ্বনিত হবে সেই সুর
কতদূর—তা কে জানে।

যাত্রা

আবৃত্তি

অমৃতলোকের যাত্রী হে অমর কবি, কোন্ প্রস্থানের
পথে তোমার একাকী অভিযান। প্রতিদিন তাই
নিজেরে করেছ মুক্ত, বিদায়ের নিত্য-আশঙ্কায়
পৃথ্বীর বন্ধন ভিত্তি নিশ্চিহ্ন করিতে বিপুল প্রয়াস

তব দিনে দিনে হয়েছে বর্ধিত। এই হাসি গান,
ক্ষণিকের অনিশ্চিত বুদ্বুদের মতো ; নশ্বর জীবন
অনন্ত কালের তুচ্ছ কণিকার প্রায় হাসি ও ক্রন্দনে
ক্ষয় হয়ে যায় তাই ওরা কিছু নয়, তুমিও জানিতে,
'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধন-মান'
তবু তুমি শিল্পীর তুলিকা নিয়ে করেছ অঙ্কিত
সভ্যতার প্রত্যেক সম্পদ, সুন্দরের সুন্দর অর্চনা।
বিশ্বপ্রদর্শনী মাঝে উজ্জ্বল তোমার সৃষ্টিগুলি
পৃথিবীর বিরাট সম্পদ। স্রষ্টা তুমি, দ্রষ্টা তুমি
নূতন পথের। সেই তুমি আজ পথে পথে,
প্রয়াণের অস্পষ্ট পরিহাসে আমাদের করেছ
উন্মাদ। চেয়ে দেখি চিতা তব জ্বলে যায় অসহ্য
দাহনে, জ্বলে যায় ধীরে ধীরে প্রত্যেক অন্তর।
তুমি কবি, তুমি শিল্পী, তুমি যে বিরাট, অভিনব
সবারে কাঁদায়ে যাও চুপি চুপি একী লীলা তব॥

বিদায়

গান

ঝুলন-পূর্ণিমাতে
নীরব নিঠুর মরণ সাথে
কে তুমি ওগো মিলন-রাখী
বাঁধিলে হাতে ?

শ্রাবণদিনে উদাস হাওয়া
কাঁদিল একী,
পথিক রবির চলে যাওয়া
চাহিয়া দেখি,
ব্যাকুল প্রাণে সজলঘন
নয়ন পাতে ॥
বিদায় নিতে চায় কে ওরে
বাঁধরে তারে বজ্রডোরে
আলোর স্বপন ভেঙেছে মোর,
আঁধার যেথায় শ্রাবণ ভোর
ঘুম টুটে মোর সকল-হারা
এই প্রভাতে ॥

প্রণতি

সমবেত গান

নমো রবি, সূর্য দেবতা
জয় অগ্নি-কিরণময় জয় হে
সহস্র-রশ্মি বিভাসিত,
চির অক্ষয় তব পরিচয় হে।
জয় ধ্বান্ত-বিনাশক জয় সূর্য
দিকে দিকে বাজে তব জয়-তূর্য
অনুক্ষণ কাঁদে মন, অকারণ অকারণ

কোথা তুমি মহামঙ্গলময় হে।
কোথা সৌম্য শান্ত তব দীপ্ত ছবি
কোথা লাবণ্যপুঞ্জ হে ইন্দ্র রবি,
তুমি চিরজাগ্রত তুমি পুণ্য
রবিহীন আজি কেন মহাশূন্য
যুগে যুগে দাও তব আশিস অভয় হে

হরতাল

হরতাল

রেলে 'হরতাল' 'হরতাল' একটা রব উঠেছে! সে খবর ইঞ্জিন, লাইন, ঘণ্টা, সিগন্যাল এদের কাছেও পৌঁছে গেছে। তাই এরা একটা সভা ডাকল। মস্ত সভা। পূর্ণিমার দিন রাত দুটোয় অস্পষ্ট মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোর নীচে সবাই জড়ো হল। হাঁপাতে হাঁপাতে বিশালবপু সভাপতি ইঞ্জিন মশাই এলেন। তাঁর লেট হয়ে গেছে। লম্বা চেহারার সিগন্যাল সাহেব এলেন হাত দুটো লটপট করতে করতে, তিনি কখনো নীল চোখে, কখনো লাল চোখে তাকান। বন্দুক উঁচোনো সিপাইদের মতো সারি বেঁধে এলেন লাইন-ক্লিয়ার করা যন্ত্রের হাতলেরা। ঠকাঠক ঠকাঠক করতে করতে রোগা রোগা লাইন আর টেলিগেরাফের খুঁটিরা মিছিল করে সভা ভরিয়ে দিল। ফাজলামি করতে করতে ইস্‌টিশানের ঘণ্টা আর গার্ড সাহেবের লাল-সবুজ নিশানেরাও হাজির। সভা জমজমাট। সভাপতি শুরু করলেন :

"ভাই সব, তোমরা শুনেছ মানুষ মজুরেরা হরতাল করছে। কিন্তু মানুষ মজুরেরা কি জানে যে তাদের চেয়েও বেশী কষ্ট করতে হয় আমাদের, এইসব ইঞ্জিন-লাইন-সিগন্যাল-ঘণ্টাদের ? জানলে তারা আমাদের দাবিগুলিও কর্তাদের জানাতে ভুলত না। বন্ধুগণ, তোমরা জানো আমার এই বিরাট গতরটার জন্যে আমি একটু বেশী খাই, কিন্তু যুদ্ধের আগে যতটা কয়লা খেতে পেতুম এখন আর ততটা পাই না, অনেক কম পাই। অথচ অনেক বেশী মানুষ আর মাল আমাদের টানতে হচ্ছে যুদ্ধের পর থেকে। তাই বন্ধুগণ, আমরা এই ধর্মঘটে সাহায্য করব। আর কিছু না হোক, বছরের পর বছর একটানা খাটুনির হাত থেকে কয়েক দিনের জন্যে আমরা রেহাই পাব। সেইটাই আমাদের লাভ হবে। তাতে শরীর একটু ভাল হতে পারে।

প্রস্তাব সমর্থন করে ইঞ্জিনের চাকারা বলল : ধর্মঘট হলে আমরা এক-পাও নড়ছি না, দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকব সকলে।

সিগন্যাল সাহেব বলল: মানুষ-মজুর আর আমাদের বড়বাবু ইঞ্জিন মশাইরা তবু কিছু খেতে পান। আমরা কিছুই পাই না, আমরা খাঁটি মজুর। হরতাল হলে আমি আর রাস্তার পুলিশের মতো হাত ওঠান-নামান মানবো না; চোখ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে পড়ে থাকব।

লাইন ক্লিয়ার করা যন্ত্রের হাতল বলল: আমরাও হরতাল করব। হরতালের সময় হাজার ঠেলাঠেলিতেও আমরা নড়ছি না। দেখি কি করে লাইন ক্লিয়ার হয়।

লাইনেরা বলল: ঠিক্ ঠিক্, আমরাও নট নড়ন-চড়ন, দাদা।

ইস্‌টিশানের ঘণ্টা বলল: সে সময় আমায় খুঁজেই পাবে না কেউ। ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াব। লাল-সবুজ নিশান বন্ধুরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ট্রেন ছাড়বে কি করে?

সভাপতি ইঞ্জিন মশাই বললেন: আমাকে বড়বাবু ইঞ্জিন মশাই বলে আর সম্মান করতে হবে না। আমি তোমাদের, বিশেষ করে আমার অধীনস্থ কর্মচারী চাকাদের কথা শুনে এতই উৎসাহিত হয়েছি যে আমি ঠিক করেছি অনশন ধর্মঘট করব। এক টুকরো কয়লাও আমি খাব না, তাহলেই সব অচল হয়ে পড়বে।

এদিকে কতকগুলো ইস্‌টিশানের ঘড়ি আর বাঁশি এসেছিল কর্তাদের দালাল হয়ে সভা ভাঙবার জন্যে। সভার কাজ ঠিক মতো হচ্ছে দেখে বাঁশিগুলো টিক্ টিক্ করে টিট্‌কিরী মেরে হট্টগোল করতে লাগল। অমনি সবাই হৈ হৈ করে তেড়ে মেড়ে মারতে গেল ঘড়ি আর বাঁশিদের। ঘড়িরা আর কী করে, প্রাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি ছ'টা বাজিয়ে দিল। অমনি সূর্য উঠে পড়ল। দিন হতেই সকলে ছুটে চলে গেল যে যার জায়গায়। সভা আর সেদিন হল না।

লেজের কাহিনী

একটি মাছি একজন মানুষের কাছে উড়ে এসে বলল : তুমি সব জানোয়ারের মুরুব্বি, তুমি সব কিছুই করতে পার, কাজেই আমাকে একটি লেজ করে দাও।

মানুষটি বললে : কি দরকার তোমার লেজের ?

মাছিটি বললে : আমি কি জন্যে লেজ চাইছি ? যে জন্যে সব জানোয়ারের লেজ আছে সুন্দর হবার জন্যে।

মানুষটি তখন বলল : আমি তো কোনো প্রাণীকেই জানি না যার শুধু সুন্দর হবার জন্যেই লেজ আছে। তোমার লেজ না হলেও চলবে।

এই কথা শুনে মাছিটি ভীষণ ক্ষেপে গেল আর সে লোকটিকে জব্দ করতে আরম্ভ করে দিল। প্রথমে সে বসল তার আচারের বোতলের ওপরে, তারপর নাকে সুড়সুড়ি দিল, তারপর এ-কানে ও-কানে ভন্‌ভন্‌ করতে লাগল। শেষকালে লোকটি বাধ্য হয়ে তাকে বললে : বেশ, তুমি উড়ে উড়ে বনে, নদীতে, মাঠে যাও, যদি তুমি কোনো জন্তু, পাখি কিংবা সরীসৃপ দেখতে পাও যার কেবল সুন্দর হবার জন্যেই লেজ আছে, তার লেজটা তুমি নিতে পার। আমি তোমায় পুরো অনুমতি দিচ্ছি।

এই কথা শুনে মাছিটি আহ্লাদে আটখানা হয়ে জানলা দিয়ে সোজা উড়ে চলে গেল।

বাগান দিয়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল একটা গুটিপোকা পাতার ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। সে তখন গুটিপোকার কাছে উড়ে এসে চেঁচিয়ে বলল : গুটিপোকা ! তুমি তোমার লেজটা আমাকে দাও, ওটা তো কেবল তোমার সুন্দর হবার জন্যে।

গুটিপোকা : বটে ? বটে ? আমার মোটে লেজই হয় নি, এটা তো আমার পেট। আমি এটাকে টেনে ছোট করি, এইভাবে আমি চলি। আমি হচ্ছি, যাকে বলে, বুকে-হাঁটা প্রাণী।

মাছি দেখল তার ভুল হয়েছে, তাই সে দূরে উড়ে গেল।

তারপর সে নদীর কাছে এল। নদীর মধ্যে ছিল একটা মাছ আর একটা চিংড়ি। মাছি মাছটিকে বলল : তোমার লেজটা আমায় দাও, ওটা তো কেবল তোমার সুন্দর হবার জন্যে আছে।

মাছ বলল : এটা কেবল সুন্দর হবার জন্যে আছে তা নয়, এটা আমার দাঁড়। তুমি দেখ, যদি আমি ডান-দিকে বেঁকতে চাই তাহলে লেজটা আমি বাঁ-দিকে বেঁকাই আর বাঁ-দিকে চাইলে ডান-দিকে বেঁকাই। আমি কিছুতেই আমার লেজটি তোমায় দিতে পারি না।

মাছি তখন চিংড়িকে বলল : তোমার লেজটা তাহলে আমায় দাও, চিংড়ি!

চিংড়ি জবাব দিল : তা আমি পারব না। দেখ না, আমার পা-গুলো চলার পক্ষে কি রকম সরু আর দুর্বল, কিন্তু আমার লেজটি চওড়া আর শক্ত। যখন আমি জলের মধ্যে এটা নাড়ি, তখন এ আমায় ঠেলে নিয়ে চলে। নাড়ি-চাড়ি, নাড়ি-চাড়ি,—আর যেখানে খুশি সাঁতার কেটে বেড়াই। আমার লেজও দাঁড়ের মতো কাজ করে।

মাছি আরো দূরে উড়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে মাছি একটা হরিণকে তার বাচ্চার সঙ্গে দেখতে পেল। হরিণটির ছোট্ট একটি লেজ ছিল—ক্ষুদে নরম, সাদা লেজ।

অমনি মাছি ভন্‌ভন্‌ করতে আরম্ভ করল : তোমার ছোট্ট লেজটি দাও না হরিণ!

হরিণ ভয় পেয়ে গেল।

হরিণ বললে : কেন ভাই? কেন? যদি তোমায় আমি লেজটা দিই, তাহলে আমি যে আমার বাচ্চাদের হারাব।

অবাক হয়ে মাছি বললে : তোমার লেজ তাদের কি কাজে লাগবে?

হরিণ বললে : বাঃ, কী প্রশ্নই না তুমি করলে! ধর, যখন একটা নেকড়ে আমাদের তাড়া করে--তখন আমি বনের মধ্যে ছুটে গিয়ে লুকোই আর ছানারা আমার পিছু নেয়। কেবল তারাই আমায় গাছের মধ্যে দেখতে পায়, কেন না আমি আমার ছোট্ট সাদা লেজটা রুমালের মতো নাড়ি, যেন বলি : এই দিকে, বাছারা, এই দিকে। তারা তাদের সামনে সাদা মতো একটা কিছু নাড়তে দেখে আমার পিছু নেয়। আর এইভাবেই আমরা নেকড়ের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচি।

নিরুপায় হয়ে মাছি উড়ে গেল।

সে উড়তে লাগল--যতক্ষণ না সে একটা বনের মধ্যে গাছের ডালে একটা কাঠঠোক্‌রাকে দেখতে পেল।

তাকে দেখে মাছি বলল : কাঠঠোক্‌রা, তোমার লেজটা আমায় দাও। এটা তো তোমার শুধু সুন্দর হবার জন্যে।

কাঠঠোক্‌রা বললে : কী মাথা-মোটা তুমি! তাহলে কি করে আমি কাঠ ঠুক্‌রে খাবার পাব? কি করে বাসা তৈরী করব বাচ্চাদের জন্যে?

মাছি বলল : কিন্তু তুমি তো তা তোমার ঠোঁট দিয়েই করতে পার!

কাঠঠোক্‌রা জবাব দিল : ঠোঁট কেবল ঠোঁটই। কিন্তু লেজ ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না। তুমি দেখ, কিভাবে আমি ঠোক্‌রাই।

কাঠঠোক্‌রা তার শক্ত লেজ দিয়ে গাছের ছাল আঁকড়ে ধরে গা দুলিয়ে এমন ঠোক্কর দিতে লাগল যে তার থেকে ছালের চোকলা উড়তে লাগল।

মাছি এটা না মেনে পারল না যে, কাঠঠোক্‌রা যখন ঠোক্‌রায় তখন সে লেজের ওপর বসে। এটা ছাড়া সে কিছুই করতে পারে না। এটা তার ঠেক্‌নার কাজ করে।

মাছি আর কোথাও উড়ে গেল না। মাছি দেখতে পেল সব প্রাণীর লেজই কাজের জন্যে। বে-দরকারী লেজ কোথাও নেই—বনেও না, নদীতেও না। সে মনে মনে ভাবল—বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। "আমি লোকটাকে সোজা করবই। যতক্ষণ না সে আমায় লেজ করে দেন আমি তাকে কষ্ট দেব।"

মানুষটি জানলায় বসে বাগান দেখছিল। মাছি তার নাকে এসে বসল। লোকটি নাক ঝাড়া দিল, কিন্তু ততক্ষণে সে তার কপালে গিয়ে ব'সে পড়েছে। লোকটি কপাল নাড়ল—মাছি তখন আবার তার নাকে।

লোকটি কাতর প্রার্থনা জানাল: আমায় ছেড়ে দাও, মাছি।

ভন্‌ভন্‌ করে মাছি বলল: কিছুতেই তোমায় ছাড়ব না। কেন তুমি আমায় অকেজো লেজ আছে কি না দেখতে পাঠিয়ে বোকা বানিয়েছ। আমি সব প্রাণীকেই জিগ্‌গেস করেছি—তাদের সবার লেজই দরকারী।

লোকটি দেখল মাছি ছাড়বার পাত্র নয়—এমনই বদ এটা। একটু ভেবে সে বলল: মাছি, মাছি! দেখ, মাঠে গরু রয়েছে। তাকে জিগ্‌গেস করো তার লেজের কী দরকার।

মাছি জানলা দিয়ে উড়ে গিয়ে গরুর পিঠে বসে ভন্‌ভন্‌ করে জিগ্‌গেস করল: গরু, গরু! তোমার লেজ কিসের জন্যে? তোমার লেজ কিসের জন্যে?

গরু একটি কথাও বলল না—একটি কথাও না। তারপর হঠাৎ সে তার লেজ দিয়ে নিজের পিঠে সপাৎ করে মারল—আর মাছি ছিট্‌কে পড়ে গেল।

মাটিতে পড়ে মাছির শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল—পা দুটো উঁচু হয়ে রইল আকাশের দিকে।

লোকটি জানলা থেকে বলল: এ-ই ঠিক করেছে মাছির।

মানুষকে কষ্ট দিও না, প্রাণীদেরও কষ্ট দিও না। তুমি আমাদের কেবল জ্বালিয়ে মেরেছ।

[সোভিয়েট শিশুসাহিত্যিক ভি, বিয়াঙ্কির "টেইল্‌স্‌" গল্পের অনুবাদ।]

ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা

একটি লোকের একটা ষাঁড়, একটা গাধা আর একটা ছাগল ছিল। লোকটি বেজায় অত্যাচার করত তাদের ওপর। ষাঁড়কে দিয়ে ঘানি টানাত, গাধা দিয়ে মাল বওয়াত আর ছাগলের সবটুকু দুধ দুয়ে নিয়ে বাচ্চাদের কেটে কেটে খেত, কিন্তু তাদের কিছুই প্রায় খেতে দিত না। কথায় কথায় বেদম প্রহার দিত।

তিনজনেই সব সময় বাঁধা থাকত, কেবল রাত্তির বেলায় ছাগল-ছানাদের শেয়ালে নিয়ে যাবে ব'লে গোয়ালঘরের মাচায় ছাগলকে না বেঁধেই ছানাদের সঙ্গে রাখা হত।

একদিন দিনের বেলায় কি ক'রে যেন ষাঁড়, গাধা, ছাগল তিনজনেই ছাড়া অবস্থায় ছিল। লোকটিও কি কাজে বাইরে গিয়ে ফিরতে দেরি ক'রে ফেলল। তিনজনের অনেক দিনের খিদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই গাধা সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ভাল ভাল জিনিস খেতে আরম্ভ করল। ষাঁড়টা কিছুক্ষণের মধ্যেই সাফ করে ফেলল লোকটির চমৎকার তরকারির বাগানটা। ছাগলটা আর কী করে, কিছুই যখন খাবার নেই, তখন সে বারান্দায় মেলা একটা আস্ত কাপড় খেয়ে ফেলল মনের আনন্দে।

লোকটি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে তাজ্জব ব'নে গেল। তারপর

চেলাকাঠ দিয়ে এমন মার মারল তিনজনকে যে আশপাশের পাঁচটা গ্রাম জেনে গেল লোকটির বাড়ি কিছু হয়েছে। সেদিনকার মতো তিনজনেরই খাওয়া বন্ধ করে দিল লোকটি।

রাত হতেই মাচা থেকে টুক ক'রে লাফিয়ে পড়ল ছাগল। তারপর গাধা আর ষাঁড়কে জিজ্ঞেস করল : গাধা ভাই, ষাঁড় ভাই, জেগে আছ!

দুজনেই বলল : হ্যাঁ, ভাই!

ছাগল বলল : কি করা যায়?

ওরা বলল : কী আর করব, গলা যে বাঁধা!

ছাগল বলল : সেজন্যে ভাবনা নেই, আমি কি-না খাই? আমি এখুনি তোমাদের গলার দড়ি দুটো খেয়ে ফেলছি। আর খিদেও যা পেয়েছে!

ছাগল দড়ি দুটো খেয়ে ফেলতেই তিনজনের পরামর্শ-সভা শুরু হয়ে গেল।

তারা পরামর্শ করে একটা 'সমিতি' তৈরী করল। ঠিক হল আবার যদি এইরকম হয়, তাহলে তিনজনেই একসঙ্গে লোকটিকে আক্রমণ করবে। ষাঁড় আর গাধা দুজনে একমত হয়ে ছাগলকে সমিতির সম্পাদক করল। কিন্তু গোল বাধল সভাপতি হওয়া নিয়ে। ষাঁড আর গাধা দুজনেই সভাপতি হতে চায়। বেজায় ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। শেষকালে তারা কে বেশী যোগ্য ঠিক করবার জন্যে, সালিশী মানতে মোড়লের বাড়ি গেল। ছাগলকে রেখে গেল লোকটির ওপুর নজর রাখতে। মোড়ল ছিল লোকটির বন্ধু। গাধাটা চেঁচামেচি করে ঘুম ভাঙাতেই বাইরে বেরিয়ে মোড়ল চিনল এই দুটি তার বন্ধুর ষাঁড় আর গাধা। সে সব কথা শুনে বলল : বেশ, তোমরা এখন আমার বাইরের ঘরে খাও আর বিশ্রাম কর, পরে তোমাদের বলছি কে যোগ্য বেশী। ব'লে সে তার গোয়ালঘর দেখিয়ে দিল। দুজনেরই খুব খিদে। তারা গোয়ালঘরে ঢুকতেই মোড়ল গোয়ালের

শিকল তুলে দিয়ে বলল : মানুষের বিরুদ্ধে সমিতি গড়ার মজাটা কি, কাল সকালে তোমাদের মনিবের হাতে টের পাবে।

এদিকে অনেক রাত হয়ে যেতেই ছাগল বুঝল ওরা বিপদে পড়েছে, তাই আসতে দেরি হচ্ছে। সে তার ছানাদের নিয়ে প্রাণের ভয়ে ধীরে ধীরে লোকটির বাড়ি ছেড়ে চলে গেল বনের দিকে।

সকাল হতেই খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল চারিদিকে। লোকটি এক সময়ে খবর পেল ষাঁড় আর গাধা আছে তার মোড়ল-বন্ধুর বাড়ি। অমনি দড়ি আর লাঠি নিয়ে ছুটল সে মোড়লের কাছে, জানোয়ার আনতে।

'মানুষকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই' এই কথা ভাবতে ভাবতে খালি পেটে ষাঁড় আর গাধা পালাবার মতলব আঁটছিল। এমন সময় সেখানে লোকটি হাজির হল। তারপর লোকটির হাতে প্রচণ্ড মার খেতে খেতে ফিরে এসে গাধা আর ষাঁড় আবার মাল বইতে আর ঘানি টানতে শুরু করল আগের মতোই। কেবল ছাগলটাই আর কখনো ফিরে এল না। কারণ অনেক মহাপুরুষের মতো ছাগলটারও একটু দাড়ি ছিল।

উপদেশ : নিজের কাজের মীমাংসা করতে অন্যের কাছে কখনো যেতে নেই।

দেবতাদের ভয়

[পাত্র-পাত্রী : ইন্দ্র, ব্রহ্মা, নারদ, অগ্নি, বরুণ ও পবন]

ইন্দ্র : কি ব্যাপার ?

ব্রহ্মা : আমার এত কষ্টের ব্রহ্মাণ্ডটা বোধহয় ছারখার হয়ে গেল। হায়—হায়—হায় !

নারদ : মানুষের হাত থেকে স্বর্গের আর নিস্তার নেই মহারাজ, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ইন্দ্র : আঃ, বাজে বকবক না করে আসল ব্যাপারটা খুলে বলুন না, কি হয়েছে ?

ব্রহ্মা : আর কী হয়েছে ! অ্যাটম বোমা !—বুঝলে ? অ্যাটম বোমা।

ইন্দ্র : কই, অ্যাটম বোমার সম্বন্ধে কাগজে তো কিছু লেখে নি ?

নারদ : ও আপনার পাঁচ বছরের পুরনো মফঃস্বল সংস্করণ কাগজ। ওতে কি ছাই কিছু আছে নাকি ?

ইন্দ্র : অ্যাটম বোমাটা তবে কি জিনিস ?

ব্রহ্মা : মহাশক্তিশালী অস্ত্র ! পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে।

ইন্দ্র : আমার বজ্রের চেয়েও শক্তিশালী ?

নারদ : আপনার বজ্রে তো শুধু একটা তালগাছ মরে, এতে পৃথিবীটাই লোপাট হয়ে যাবে।

ইন্দ্র : তাইতো, বড় চিন্তার কথা। এই রকম অস্ত্র আমরা তৈরী করতে পারি না ? বিশ্বকর্মা কি বলে ?

নারদ : বিশ্বকর্মা বলছে তার সেকেলে মালমশলা আর যন্ত্রপাতি দিয়ে ওসব করা যায় না। তা ছাড়া সে যা মাইনে পায় তাতে অত খাটুনি পোষায়ও না।

ইন্দ্র : তবে তো মুস্কিল ! ওরা আমার পুষ্পকরথের নকল করে এরোপ্লেন করেছে, আর বজ্রের নকল করে অ্যাটম বোমাও করল। এবার যদি হানা দেয় তা হলেই সেরেছে। আচ্ছা অগ্নি, তুমি পৃথিবীটাকে পুড়িয়ে দিতে পার না ?

অগ্নি : আগে হলে পারতুম। আজকাল দমকলের ঠেলায় দম আটকে মারা যাই যাই অবস্থা।

ইন্দ্র : বরুণ ! তুমি ওদের জলে ডুবিয়ে মারতে পার না ?

বরুণ : পরাধীন দেশ হলে পারি। এই তো সেদিন চট্টগ্রামকে ডুবিয়ে দিলুম। কিন্তু স্বাধীন দেশে আর মাথাটি তোলবার জো নেই। কেবল ওরা বাঁধ দিচ্ছে।

ইন্দ্র : পবন ?

পবন : পরাধীন দেশের গরিবদের কুঁড়েগুলোই শুধু উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে লাভ কি ?

ইন্দ্র : আমাদের তৈরী মানুষগুলোর এত আস্পর্ধা ? দাও সব স্বর্গের মজুরদের পাঁচিল তোলার কাজে লাগিয়ে—।

নারদ : কিন্তু তারা যে ধর্মঘট করেছে।

ইন্দ্র : ধর্মঘট কেন ? কি তাদের দাবি ?

নারদ : আপনি যেভাবে থাকেন তারাও সেইভাবে থাকতে চায়।

ইন্দ্র : (ঠোঁট কামড়িয়ে) বটে ? মহাদেব আর বিষ্ণু কি করছেন ?

ব্রহ্মা : মহাদেব গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছেন আর বিষ্ণু অনন্ত শয়নে নাক ডাকাচ্ছেন।

ইন্দ্র : এঁদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। আচ্ছা, মানুষগুলোকে ডেকে বুঝিয়ে দিতে পার যে এতই যখন করছে তখন ওরা একটা আলাদা স্বর্গ বানিয়ে নিক না কেন ?

নারদ : তা তো করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া নাকি ওদের কাছে স্বর্গ, খাওয়া পরার কষ্ট নাকি কারুর সেখানে নেই। সবাই সেখানে নাকি সুখী।

ইন্দ্র : কিন্তু সেখানে কেউ তো অমর নয়।

ব্রহ্মা : নয়। কিন্তু মরা মানুষ বাঁচানোর কৌশলও সেখানে আবিষ্কার হয়েছে। অমর হতে আর বাকি কী ?

ইন্দ্র : তা হলে উপায় ?

ব্রহ্মা : উপায় একটা আছে। ওদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটিটা যদি বজায় রাখা যায় তা হলেই ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে মারা পড়বে, আমরাও নিশ্চিন্ত হব।

ইন্দ্র : তা হলে নারদ, তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি চলে যাও সটান পৃথিবীতে। সেখানে লোকদের বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের বিষ ঢুকিয়ে দাও। তা হলেই— তা হলেই আমাদের স্বর্গ মানুষের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

নারদ : তথাস্তু। আমার ঢেঁকিও তৈরী আছে।

[নারদের প্রস্থান]

রাখাল ছেলে

সূর্য যখন লাল টুকটুকে হয়ে দেখা দেয় ভোরবেলায়, রাখাল ছেলে তখন গরু নিয়ে যায় মাঠে। আর সাঁঝের বেলায় যখন সূর্য ডুবে যায় বনের পিছনে, তখন তাকে দেখা যায় ফেরার পথে। একই পথে তার নিত্য যাওয়া-আসা। বনের পথ দিয়ে সে যায় নদীর ধারের সবুজ মাঠে। গরুগুলো সেখানেই চ'রে বেড়ায়। আর সে বসে থাকে গাছের ছায়ায় বাঁশিটি হাতে নিয়ে, চুপ করে চেয়ে থাকে নদীর দিকে, আপন মনে ঢেউ গুনতে গুনতে কখন যেন বাঁশিটি তুলে নিয়ে তাতে ফুঁ দেয়। আর সেই সুর শুনে নদীর ঢেউ নাচতে থাকে, গাছের পাতা দুলতে থাকে আর পাখিরা কিচির-মিচির করে তাদের আনন্দ জানায়!

একদিন দোয়েল পাখি তাকে ডেকে বলে :

॥ গান ॥

ও ভাই, রাখাল ছেলে !
এমন সুরের সোনা বলো কোথায় পেলে।
আমি যে রোজ সাঁঝ-সকালে,
বসে থাকি গাছের ডালে,
তোমার বাঁশির সুরেতে প্রাণ দিই ঢেলে ॥

তোমার বাঁশির সুর যেন গো নির্ঝরিণী
তাই শোনে রোজ পিছন হতে বনহরিণী।
চুপি চুপি আড়াল থেকে
সে যায় গো তোমায় দেখে
অবাক হয়ে দেখে তোমায় নয়ন মেলে ॥

রাখাল ছেলে অবাক হয়ে দেখে সত্যিই এক তুষ্টু হরিণী লতাগুল্মের আড়াল থেকে মুখ বার করে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে তার দিকে। সে তাকে বললে :

ওগো বনের হরিণী !
তুমি রইলে কেন দূরে দূরে,
বিভোর হয়ে বাঁশির সুরে,
আমি তো কাছে এসে বসতে তোমায়
নিষেধ করি নি।

হরিণীর ভয় ভেঙে গেল, সে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এল রাখাল ছেলের কাছে। সে তার পাশটিতে এসে চোখে চোখ মিলিয়ে শুনতে লাগল তার বাঁশি। অবোধ বনের পশু মুগ্ধ হল বাঁশির তানে। তারপর প্রতিদিন সে এসে বাঁশি শুনত, যতক্ষণ না তার রেশটুকু মিলিয়ে যেত বনান্তরে।

হরিণীর মা-র কিন্তু পছন্দ হল না তার মেয়ের এই বাঁশি-শোনা। তাই সে মেয়েকে বললে :

ও আমার দুষ্টু মেয়ে,
রোজ সকালে নদীর ধারে যাস কেন ধেয়ে।
ভুল ক'রে আর যাস্‌নেরে তুই শুনতে বাঁশি
ওরা সব দুষ্টু মানুষ মন ভুলাবে মিষ্টি হাসি
বুঝি বা ফাঁদ পেতেছে ওরা তোকে একলা পেয়ে॥

তখন হরিণী তার মা-কে বুঝোয় :

না গো মা, ভয় ক'রো না
সে তো মানুষ নয়।
সে যে গো রাখাল ছেলে,
আমি তার কাছে গেলে
বড্ড খুশি হয়॥

এমনি ক'রে সুরের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে হরিণী।' রাখাল ছেলে হরিণীকে শোনায় বাঁশি, আর হরিণী রাখাল ছেলেকে শোনায় গান :

তোমার বাঁশির সুর যেন গো
নদীর জলে ঢেউয়ের ধ্বনি,
পাতায় পাতায় কাঁপন জাগায়
মাতায় বনের দিনরজনী।
সকাল হলে যখন হেথায় আস
বাঁশির সুরে সুরে আমায় গভীর ভালবাসো—
মনের পাখায় উড়ে আমি
স্বপনপুরে যাই তখনি॥

কিন্তু হরিণীর নিত্যি স্বপনপুরে যাওয়া আর হল না। একদিন এক শিকারী এল সেই বনে। দূর থেকে সে অবাক হয়ে দেখল একটি রাখাল ছেলে বিহ্বল হয়ে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে আর একটি বন্য হরিণী তার পাশে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে। কিন্তু শিকারীর মন ভিজল না সেই স্বর্গীয় দৃশ্যে, সে এই সুযোগের অপব্যয় না করে বধ করল হরিণীকে। মৃত্যুপথযাত্রী হরিণী তখন রাখাল ছেলেকে বললে —বাঁশিতে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের আমি বিশ্বাস করে-ছিলাম। কিন্তু সেই তুমি, বোধহয় মানুষ বলেই, আমার মৃত্যুর কারণ হলে। তবু তোমায় মিনতি করছি :

বাঁশি তোমার বাজাও বন্ধু
আমার মরণকালে,
মরণ আমার আসুক আজি
বাঁশির তালে তালে।
যতক্ষণ মোর রয়েছে প্রাণ
শোনাও তোমার বাঁশরির তান
বাঁশির তরে মরণ আমার
ছিল মন্দ-ভালে।
বনের হরিণ আমি যে গো
কারুর সাড়া পেলে,
নিমেষে উধাও হতাম
সকল বাধা ঠেলে।
সেই আমি বাঁশরির তানে
কিছুই শুনি নি কানে
তাই তো আমি জড়ালেম এই
কঠিন মরণ-জালে॥

বাঁশি শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে হরিণীর মৃত্যু হল। সাথীকে হারিয়ে রাখাল ছেলে অসীম দুঃখ পেল। সে তখন কেঁদে বললে :

বিদায় দাও গো বনের পাখি !
বিদায় নদীর ধার,
সাথীকে হারিয়ে আমার
বাঁচা হল ভার।
আর কখনো হেথায় আসি
বাজাব না এমন বাঁশি
আবার আমার বাঁশি শুনে
মরণ হবে কার।

বনের পাখি, নদীর ধার সবাই তাকে মিনতি করল—তুমি যেও না।

যেও না গো রাখাল ছেলে
আমাদেরকে ছেড়ে
তুমি গেলে বনের হাসি
মরণ নেবে কেড়ে,
হরিণীর মরণের তরে
কে কোথা আর বিলাপ করে
ক্ষণিকের এই ব্যথা তোমার
আপনি যাবে সেরে।

দূর থেকে শুধু রাখাল ছেলে বলে গেল :

ডেকো না গো তোমরা আমায়
চলে যাবার বেলা,
রাখাল ছেলে খেলবে না আর
মরণ-বাঁশির খেলা॥